হূদ
১১

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, এটা সূরা ইউনূসের সমসময়ে নাযিল হয়েছিল। এমনকি তার অব্যবহিত পরেই যদি নাযিল হয়ে থাকে তবে তাও বিচিত্র নয়। কারণ ভাষণের মূল বক্তব্য একই। তবে সতর্ক করে দেয়ার ধরনটা তার চেয়ে বেশী কড়া।

হাদীসে আছে। হযরত আবু বকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ "আমি দেখছি আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি?" জবাবে তিনি বলেন, شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا "সূরা হূদ ও তারই মতো বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরাগুলো আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।" এ থেকে অনুমান করা যাবে, যখন একদিকে কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নিজেদের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক এসব সতর্কবাণী নাযিল হচ্ছিল, তখনকার সময়টা তাঁর কাছে কত কঠিন ছিল। সম্ভবত এহেন অবস্থায় সর্বক্ষণ এ আশংকা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল যে, আল্লাহর দেয়া অবকাশ কখন নাজানি খতম হয়ে যায় এবং সেই শেষ সময়টি এসে যায় যখন আল্লাহ কোন জাতির ওপর আযাব নাযিল করে তাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন। আসলে এ সূরাটি পড়ার সময় মনে হতে থাকে যেন একটি বন্যার বাঁধ ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং যে অসতর্ক জনবসতিটি এ বন্যার গ্রাস হতে যাচ্ছে তাকে শেষ সাবধান বাণী শুনানো হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

যেমন একটু আগেই বলেছি, ভাষণের বিষয়বস্তু সূরা ইউনূসের অনুরূপ। অর্থাৎ দাওয়াত, উপদেশ ও সতর্কবাণী। তবে পার্থক্য হচ্ছে, সূরা ইউনূসের তুলনায় দাওয়াতের অংশ এখানে সংক্ষিপ্ত, উপদেশের মধ্যে যুক্তির পরিমাণ কম ও ওয়াজ–নসীহত বেশী এবং সতর্কবাণীগুলো বিস্তারিত ও বলিষ্ঠ।

এখানে দাওয়াত এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ নবীর কথা মেনে নাও, শিরক থেকে বিরত হও অন্য সবার বন্দেগী ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও এবং নিজেদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে তোলো।

উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকের ওপর ভরসা করে যেসব জাতি আল্লাহর নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে ইতিপূর্বেই তারা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় যে পথটি ধ্বংসের পথ হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই একই পথে তোমাদেরও চলতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে নাকি?

সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ আযাব আসতে যে দেরী হচ্ছে, তা আসলে একটা অবকাশ মাত্র।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের এ অবকাশ দান করছেন। এ অবকাশকালে যদি তোমরা সংযত ও সংশোধিত না হও তাহলে এমন আযাব আসবে যাকে হটিয়ে দেবার সাধ্য কারোর নেই এবং যা ঈমানদারদের ক্ষুদ্রতম দলটি ছাড়া বাকি সমগ্র জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এ বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করাবার জন্য সরাসরি সম্বোধন করার তুলনায় নূহের জাতি, আদ, সামূদ, লূতের জাতি, মাদ্‌য়ানবাসী ও ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ঘটনাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে বেশী করে। এ ঘটনাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ আল্লাহ যখন কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে উদ্যত হন তখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতেই মীমাংসা করেন। সেখানে কাউকে সামান্যতমও ছাড় দেয়া হয় না। তখন দেখা হয় না কে কার সন্তান ও কার আত্মীয়। যে সঠিক পথে চলে একমাত্র তার ভাগেই রহমত আসে। অন্যথায় আল্লাহর গযব থেকে কোন নবীপুত্র বা নবী পত্নী কেউই বাঁচতে পারে না। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং যখন ঈমান ও কুফরীর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এসে পড়ে তখন দীনের প্রকৃতির এ দাবীই জানাতে থাকে যে, মুমিন নিজেও যেন পিতা–পুত্র ও স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারির মতো পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে একমাত্র সত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সব সম্বন্ধ কেটে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করে। এহেন অবস্থায় বংশ ও রক্ত সম্বন্ধের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্বও হবে ইসলামের প্রাণসত্তার সম্পর্ক বিরোধী। তিন চার বছর পরে বদরের ময়দানে মক্কার মুসলমানরা এ শিক্ষারই প্রদর্শনী করেছিলেন।

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿١﴾ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ﴿٢﴾ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿٣﴾ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤﴾

আলিফ—লাম—র। একটি ফরমান।[১] এর আয়াতগুলো পাকাপোক্ত এবং বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে,[২] এক পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে। (এতে বলা হয়েছে) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারীও এবং সুসংবাদদাতাও। আরো বলা হয়েছে ঃ তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন[৩] এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন।[৪] তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি অতীব ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সবকিছুই করতে পারেন।

১. মূল আয়াতে 'কিতাব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বর্ণনাভংগীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার অনুবাদ করা হয়েছে "ফরমান।" আরবী ভাষায় এ শব্দটি কেবলমাত্র কিতাব ও লিপি অর্থে ব্যবহৃত হয় না বরং হুকুম ও বাদশাহী ফরমান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অর্থাৎ এ ফরমানে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো পাকা ও অকাট্য কথা এবং সেগুলোর কোন নড়চড় নেই। ভালোভাবে যাচাই পর্যালোচনা করে সে কথাগুলো বলা

হয়েছে। নিছক বড় বড় বুলি আওড়াবার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। বক্তার বক্তৃতার যাদু এবং ভাব–কল্পনার কবিত্ব এখানে নেই। প্রকৃত ও হুবহু সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যের চেয়ে কম বা তার চেয়ে বেশী একটি শব্দও এতে নেই। তারপর এ আয়াতগুলো বিস্তারিতও। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথা খুলে খুলে ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বক্তব্য জটিল, বক্র ও অস্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি কথা আলাদা আলাদা করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাদের অবস্থান করার জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তিনি তোমাদের খারাপভাবে নয় বরং ভালোভাবেই রাখবেন। তাঁর নিয়ামতসমূহ তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাঁর বরকত ও প্রাচুর্যলাভে তোমরা ধন্য হবে। তোমরা সচ্ছল ও সুখী–সমৃদ্ধ থাকবে। তোমাদের জীবন শান্তিময় ও নিরাপদ হবে। তোমরা লাঞ্ছনা, হীনতা ও দীনতার সাথে নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে। এ বক্তব্যটিই সূরা নাহ্‌লের ৯৭ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً – (النحل : ٩٧)

"যে ব্যক্তিই ঈমান সহকারে সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।"

লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে ছড়িয়ে থাকা একটি বিভ্রান্তি দূর করাই এর উদ্দেশ্য। বিভ্রান্তিটি হচ্ছে, আল্লাহ ভীতি, সততা, সাধুতা ও দায়িত্বানুভূতির পথ অবলম্বন করলে মানুষ আখেরাতে লাভবান হলেও হতে পারে কিন্তু এর ফলে তার দুনিয়া একদম বরবাদ হয়ে যায়। এ মন্ত্র শয়তান প্রত্যেক দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ অজ্ঞ–নির্বোধের কানে ফুঁকে দেয়। এ সংগে তাকে এ প্ররোচনাও দেয় যে, এ ধরনের আল্লাহ ভীরু ও সৎলোকদের জীবনে দারিদ্র, অভাব ও অনাহার ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন, এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে তোমাদের শুধুমাত্র আখেরাতই নয়, দুনিয়াও সমৃদ্ধ হবে। আখেরাতের মতো এ দুনিয়ায় যথার্থ মর্যাদা ও সাফল্যও এমনসব লোকের জন্য নির্ধারিত, যারা আল্লাহর প্রতি যথার্থ আনুগত্য সহকারে সৎ জীবন যাপন করে, যারা পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী হয়, যাদের ব্যবহারিক জীবনে ও লেনদেনে কোন ক্লেদ ও গ্লানি নেই, যাদের ওপর প্রত্যেকটি বিষয়ে ভরসা করা যেতে পারে, যাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি কল্যাণের আশা পোষণ করে এবং কোন ব্যক্তি বা জাতি যাদের থেকে অকল্যাণের আশংকা করে না।

এ ছাড়া مَتَاعٌ حَسَنٌ (উত্তম জীবন সামগ্রী) শব্দের মধ্যে আর একটি দিকও রয়েছে। এ দিকটি দৃষ্টির আগোচরে চলে যাওয়া উচিত নয়। কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন সামগ্রী দু' প্রকারের। এক প্রকারের জীবন সামগ্রী আল্লাহ বিমুখ লোকদেরকে ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে তারা নিজেদেরকে দুনিয়া পূজা ও আল্লাহ বিস্মৃতির মধ্যে আরো বেশী করে হারিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে এটি নিয়ামত ঠিকই কিন্তু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে এটি আল্লাহর

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑤

দেখো, এরা তাঁর কাছ থেকে আত্মগোপন করার জন্য বুক ভাঁজ করছে।[৫] *সাবধান! যখন এরা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকে তখন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তা সবই আল্লাহ জানেন। তিনি তো অন্তরে যা সংগোপন আছে তাও জানেন।*

লানত ও আযাবের পটভূমিই রচনা করে। কুরআন মজীদ متاع غرور তথা প্রতারণার সামগ্রী নামেও একে স্মরণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের জীবন সামগ্রী মানুষকে আরো বেশী সচ্ছল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তাকে তার আল্লাহর আরো বেশী কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। এভাবে সে আল্লাহর, তাঁর বান্দাদের এবং নিজের অধিকার আরো বেশী করে আদায় করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর দেয়া উপকরণাদির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে সে দুনিয়ায় ভালো, ন্যায় ও কল্যাণের উন্নয়ন এবং মন্দ, বিপর্যয় ও অকল্যাণের পথ রোধ করার জন্য আরো বেশী প্রভাবশালী ও কার্যকর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ হচ্ছে কুরআনের ভাষায় উত্তম জীবন সামগ্রী। অর্থাৎ এমন উন্নত পর্যায়ের জীবন সামগ্রী যা নিছক দুনিয়ার আয়েশ আরামের মধ্যেই খতম হয়ে যায় না বরং পরিণামে আখেরাতেরও শান্তির উপকরণে পরিণত হয়।

৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি চরিত্রগুণে ও নেক আমলে যত বেশী এগিয়ে যাবে আল্লাহ তাকে ততই বড় মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহর দরবারে কারোর কৃতিত্ব ও সৎকাজকে নষ্ট করা হয় না। তাঁর কাছে যেমন অসৎকাজ ও অসৎবৃত্তির কোন মর্যাদা নেই তেমনি সৎকাজ ও সৎবৃত্তিরও কোন অমর্যদা হয় না। তাঁর রাজ্যের রীতি এ নয় যে;

"আরবী ঘোড়ার পিঠে জরাজীর্ণ জিন
আর গাধার গলায় ঝোলে সোনার শৃংখল।"

যে ব্যক্তিই নিজের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে যেরূপ মর্যাদার অধিকারী প্রমাণ করবে তাকে আল্লাহ সে মর্যাদা অবশ্যই দেবেন।

৫. মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা–সমালোচনা শুরু হলো তখন সেখানে এমন বহু লোক ছিল যারা বিরোধিতায় প্রকাশ্যে তেমন একটা তৎপর ছিল না কিন্তু মনে মনে তার দাওয়াতের প্রতি ছিল চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও বিরূপভাবাপন্ন। তারা তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলতো। তাঁর কোন কথা শুনতে চাইতো না। কোথাও তাঁকে বসে থাকতে দেখলে পেছন ফিরে চলে যেতো। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতো অথবা কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলতো, যাতে তাঁর মুখোমুখি হতে না হয় এবং তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে নিজের কথা বলতে না শুরু করে দেন। এখানে এ ধরনের লোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এরা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلٰى
أُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨﴾

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়।[৬] সবকিছুই একটি পরিষ্কার কিতাবে লেখা আছে।

তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, —যখন এর আগে তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল,[৭]—যাতে তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।[৮] এখন যদি হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো, হে লোকেরা, মরার পর তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তাহলে অস্বীকারকারীরা সংগে সংগেই বলে উঠবে। এতো সুস্পষ্ট যাদু।[৯] আর যদি আমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি পিছিয়ে দেই তাহলে তারা বলতে থাকে, কোন্ জিনিস শাস্তিটাকে আটকে রেখেছে? শোনো! যেদিন সেই শাস্তির সময় এসে যাবে সেদিন কারো ফিরানোর প্রচেষ্টা তাকে ফিরাতে পারবে না এবং যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করছে তা-ই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে।

সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং উটপাখির মতো বালির মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে মনে করে, যে সত্যকে দেখে তারা মুখ লুকিয়েছে তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। অথচ সত্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং এ তামাশাও দেখছে যে, এ নির্বোধরা তার থেকে বাঁচার জন্য মুখ লুকাচ্ছে।

৬. অর্থাৎ যে আল্লাহ এমন সূক্ষ্মজ্ঞানী যে প্রত্যেকটি পাখির বাসা ও প্রত্যেকটি পোকা-মাকড়ের গর্ত তাঁর জানা এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে তিনি তাদের

জীবনোপকরণ পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর তাছাড়া প্রত্যেকটি প্রাণী কোথায় থাকে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করে প্রতি মুহূর্তে যিনি এ খবর রাখেন, তাঁর সম্পর্কে যদি তোমরা এ ধারণা করে থাকো যে, এভাবে মুখ লুকিয়ে অথবা কানে আংগুল চেপে কিংবা চোখ বন্ধ করে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে তাহলে তোমরা বড়ই বোকা। সত্যের আহবায়ককে দেখে তোমরা মুখ লুকালে তাতে লাভ কি? এর ফলে কি তোমরা আল্লাহর কাছ থেকেও নিজেদের গোপন করতে পেরেছো? আল্লাহ কি দেখছেন না, এক ব্যক্তি তোমাদের সত্যের সাথে পরিচিত করাবার দায়িত্ব পালন করছেন আর তোমরা তার কোন কথা যাতে তোমাদের কানে না পড়ে সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো?

৭. সম্ভবত লোকদের একটি প্রশ্নের জবাবে প্রাসংগিকভাবে এ বাক্যটি মাঝখানে এসে গেছে। প্রশ্নটি ছিল, আকাশ ও পৃথিবী যদি প্রথমে না থেকে থাকে এবং পরে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে কি ছিল? এ প্রশ্নটি এখানে উল্লেখ না করেই এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে এ বলে যে, প্রথমে পানি ছিল। এ পানি মানে কি তা আমরা বলতে পারি না। পানি নামে যে পদার্থটিকে আমরা চিনি সেটি, না এ শব্দটিকে এখানে নিছক রূপক অর্থে অর্থাৎ ধাতুর বর্তমান কঠিন অবস্থার পূর্ববর্তী দ্রবীভূত (Fluid) অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? তবে আল্লাহর আরশ পানির ওপরে ছিল—এ বাক্যটির যে অর্থ আমরা বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর সাম্রাজ্য তখন পানির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৮. এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, মূলত তোমাদের (অর্থাৎ মানুষ) সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর তোমাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ওপর নৈতিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেবার জন্য। তোমাদেরকে খিলাফতের ইখতিয়ার দান করে তিনি দেখতে চান তোমাদের মধ্য থেকে কে সেই ইখতিয়ার এবং নৈতিক দায়িত্ব কিভাবে ব্যবহার ও পালন করে? এ সৃষ্টি কর্মের গভীরে যদি এ উদ্দেশ্য নিহিত না থাকতো, যদি ইখতিয়ার সোপর্দ করা সত্ত্বেও কোন পরীক্ষা, হিসেব-নিকেশ, জবাবদিহি ও শাস্তি-পুরস্কারের প্রশ্ন না থাকতো এবং নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষকে কোন পরিণাম ফল ভোগ না করে এমনি এমনিই মরে যেতে হতো, তাহলে এ সমস্ত সৃষ্টিকর্ম পুরোপুরি একটি অর্থহীন খেলা-তামাশা বলে বিবেচিত হতো এবং প্রকৃতির এ সমগ্র কারখানাটিরই একটি বাজে কাজ ছাড়া আর কোন মর্যাদাই থাকতো না।

৯. অর্থাৎ তারা এমন শোচনীয় অজ্ঞতা ও মূর্খতায় লিপ্ত যে, তারা বিশ্ব-জাহানকে একজন খেলোয়াড়ের খেলাঘর এবং নিজেদেরকে তার মনভুলানো খেলনা মনে করে বসেছে। এ নির্বোধ জনোচিত কল্পনাবিলাসে তারা এত বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়েছে যে, যখন তুমি তাদেরকে এ কর্মবহুল জীবনের নিরেট উদ্দেশ্য এবং এ সংগে তাদের নিজেদের অস্তিত্বের যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝাতে থাকো তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং তোমাকে এ বলে বিদ্রূপ করতে থাকে যে, তুমি তো যাদুকরের মতো কথা বলছো।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ
كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

আমি মানুষকে নিজের অনুগ্রহভাজন করার পর আবার কখনো যদি তাকে তা থেকে বঞ্চিত করি তাহলে সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতে থাকে। আর যদি তার ওপর যে বিপদ এসেছিল তার পরে আমি তাকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তাহলে সে বলে, আমার সব বিপদ কেটে গেছে। তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং অহংকার করতে থাকে।[১০] এ দোষ থেকে একমাত্র তারাই মুক্ত যারা সবর করে[১১] এবং সৎকাজ করে আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদানও।[১২]

১০. এ হচ্ছে মানুষের নীচতা, স্থূলদৃষ্টি ও অপরিণামদর্শিতার বাস্তব চিত্র। জীবনের কর্মচঞ্চল অংগনে পদে পদে এর সাক্ষাত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মন–মানসিকতা পর্যালোচনা করে নিজের মধ্যেও এর অবস্থান অনুভব করতে পারে। কখনো সে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে এবং শক্তি–সামর্থ লাভ করে অহংকার করে বেড়ায়। শরতের প্রকৃতি যেমন সবদিক সবুজ–শ্যামল দেখা যায় তেমনি কখনো দেখতে পায় চারদিক সবুজ শ্যামলে পরিপূর্ণ। মনের কোণে তখন একথা একবার উঁকিও দেয় না যে, এ সবুজের সমারোহ একদিন তিরোহিত হয়ে পাতা ঝরার মওসুমও আসতে পারে। কোন বিপদের ফেরে পড়লে আবেগে উত্তেজনায় সে কেঁদে ফেলে, বেদনা ও হতাশায় ডুবে যায় তার সারা মন–মস্তিষ্ক এবং এত বেসামাল হয়ে পড়ে যে, আল্লাহকে পর্যন্ত গালমন্দ করে বসে এবং তাঁর সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্বকে অভিসম্পাত করে নিজের দুঃখ–বেদনা লাঘব করতে চেষ্টা করে। তারপর যখন দুঃসময় পার হয়ে গিয়ে সুসময় এসে যায় তখন আবার সেই আগের মতোই দম্ভ ও অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং সুখ–ঐশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়।

এখানে মানুষের এ নীচপ্রকৃতির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে কেন? অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে লোকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। এখানে বলা হচ্ছে যে, আজ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত পরিবেশে যখন আমার নবী আল্লাহর নাফরমানীর পরিণামে তোমাদের ওপর আযাব নাযিল হবে বলে তোমাদের সাবধান করে দেন তখন তোমরা তাঁর একথা শুনে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতে এবং বলতে থাকো, "আরে পাগল! দেখছো না আমরা সুখ–ঐশ্বর্যের সাগরে ভাসছি,

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعۡضَ مَا يُوۡحٰۤى اِلَيۡكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدۡرُكَ اَنۡ يَّقُوۡلُوۡا لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيۡهِ كَنۡزٌ اَوۡ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ نَذِيۡرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ وَّكِيۡلٌ ﴿۱۲﴾

কাজেই হে নবী এমন যেন না হয়, তোমার প্রতি যে জিনিসের অহি করা হচ্ছে তুমি তার মধ্য থেকে কোন জিনিস (বর্ণনা করা) বাদ দেবে এবং একথায় তোমার মন সংকুচিত হবে এ জন্য যে, তারা বলবে, "এ ব্যক্তির ওপর কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন" অথবা "এর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন?" তুমি তো নিছক সতর্ককারী। এরপর আল্লাহই সব কাজের ব্যবস্থাপক।[১৩]

চারদিকে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ঝাণ্ডা উড়ছে, এ সময় দিন-দুপুরে তুমি কেমন করে দেখলে আমাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার বিভীষিকাময় স্বপ্ন।" এ অবস্থায় আসলে নবীর উপদেশের জবাবে তোমাদের এ ঠাট্টা বিদ্রূপ তোমাদের নীচ সহজাত প্রবৃত্তির একটি নিকৃষ্টতর প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তো তোমাদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকার্যাবলী সত্ত্বেও নিছক তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার কারণে তোমাদের শাস্তি বিলম্বিত করছেন। তোমাদের সংশোধিত হবার সুযোগ দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমরা এ অবকাশ কালে ভাবছো, আমাদের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য কেমন স্থায়ী বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের এ বাগানে কেমন চিরবসন্তের আমেজ লেগেছে, যেন এখানে শীতের পাতা ঝরার মওসুমের আগমনের কোন আশংকাই নেই।

১১. এখানে সবরের আর একটি অর্থ সামনে আসছে। ওপরে যে নীচতার বর্ণনা এসেছে সবর তার বিপরীত গুণ প্রকাশ করে। সবরকারী ব্যক্তি কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে। সময়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে সে নিজের রং বদলাতে থাকে না। বরং সব অবস্থায় একটি যুক্তিসংগত ও সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে এগিয়ে চলে। যদি কখনো অবস্থা অনুকূলে এসে যায় এবং সে ধনাঢ্যতা, কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়তে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় না। আর যদি কখনো বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটের করাল আঘাত তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে তাহলে এহেন অবস্থায়ও সে নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ-মুসীবত যে কোন আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায়ই তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার হৃদয়পাত্র কখনো কোন ছোট বা বড় জিনিসের আধিক্যে উপচে পড়ে না।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ এমন ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি মাফও করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কারও দেন।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَٰتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾

এরা কি বলছে, নবী নিজেই এ কিতাবটি রচনা করেছে? বলো, ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এর মতো দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর যেসব মাবুদ আছে তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারলে ডেকে নাও, যদি তোমরা (তাদেরকে মাবুদ মনে করার ব্যাপারে) সাচ্চা হয়ে থাকো।

১৩. এ বক্তব্যের অর্থ বুঝার জন্যে যে অবস্থায় এটি পেশ করা হয় সেটি অবশ্যি সামনে রাখতে হবে। মক্কা এমন একটি গোত্রের কেন্দ্রভূমি যার ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট সমগ্র আরবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ গোত্রটি যখন অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে, ঠিক তখনই সেই জনপদের এক ব্যক্তি উঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তোমরা যে ধর্মের পৌরহিত্য করছো তা পরিপূর্ণ গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার নেতার আসনে বসে আছো তার শিকড়ের গভীর মূলদেশে পর্যন্ত পচন ধরেছে এবং তা একটি গলিত ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়িতে উদ্যত। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে যে সত্য ধর্ম ও কল্যাণময় জীবন বিধান পেশ করছি তাকে গ্রহণ করা ছাড়া তোমাদের জন্য বাঁচার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তার সাথে তার নিজের পূত-পবিত্র চরিত্র এবং যুক্তিসংগত কথা ছাড়া আর এমন কোন অসাধারণ জিনিস নেই যা দেখে সাধারণ মানুষ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলে মনে করতে পারে। আর চারপাশের পরিমণ্ডলেও ধর্ম, নৈতিকতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গভীর মৌলিক ত্রুটি ছাড়া এমন কোন বাহ্যিক আলামত নেই, যা আযাব নাযিল হওয়াকে চিহ্নিত করতে পারে। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত সুস্পষ্ট আলামত একথাই প্রকাশ করছে যে, তাদের ওপর আল্লাহর (এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) দেবতাদের বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে এবং তারা যাকিছু করছে ঠিকই করছে। এহেন অবস্থায় একথা বলার ফলে জনপদের কতিপয় অত্যন্ত সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া বাদবাকি সমস্ত লোকই যে তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাই স্বাভাবিক, এর পরিণতি এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। কেউ জুলুম-নির্যাতনের সাহায্যে তাকে দাবিয়ে দিতে চায়। কেউ মিথ্যা দোষারোপ এবং আজে বাজে প্রশ্ন-আপত্তি ইত্যাদি উত্থাপন করে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কেউ বিদ্বেষমূলক বিরূপ আচরণের মাধ্যমে তার সাহস ও হিম্মত গুঁড়িয়ে দিতে চায়। আবার কেউ ঠাট্টা-তামাশা, পরিহাস, ব্যাংগ-বিদ্রূপ ও অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে তার কথাকে গুরুত্বহীন করে দিতে চায়। এভাবে কয়েক বছর ধরে এ ব্যক্তির দাওয়াতকে মোকাবিলা করা হতে থাকে। এ মোকাবিলা যে কত হৃদয়বিদারক ও হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে তা সুস্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁর নবীর হিম্মত

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٤﴾

*এখন যদি তোমাদের মাবুদরা তোমাদের সাহায্যে না পৌঁছে থাকে তাহলে জেনে রাখো এ আল্লাহর ইল্‌ম থেকে নাযিল হয়েছে এবং তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। তাহলে কি তোমরা (এ সত্যের সামনে) আনুগত্যের শির নত করছো?*১৪

অটুট রাখার জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলছেন, ভালো ও অনুকূল অবস্থায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠা এবং খারাপ ও প্রতিকূল অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়া মূলত নীচ ও হীনমন্য লোকদের কাজ। আমার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি নিজে সৎ হয় এবং সততার পথে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে অগ্রসর হয় সে-ই আসলে মর্যাদার অধিকারী। কাজেই যে ধরনের বিদ্বেষ, বিরূপ ব্যবহার, ব্যংগ-বিদ্রূপ ও মূর্খজনোচিত আচরণ দ্বারা তোমার মোকাবিলা করা হচ্ছে, তার ফলে তোমার দৃঢ়তা ও অবিচলতায় যেন ফাটল না ধরে। অহীর মাধ্যমে তোমার সামনে যে মহাসত্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে তার প্রকাশ ও ঘোষণায় এবং তার প্রতি আহবান জানাতে যেন তুমি একটুও কুন্ঠিত ও ভীত না হও। অমুক বিষয়টি শোনার সাথে সাথেই যখন লোকেরা তা নিয়ে ব্যংগ-বিদ্রূপ করতে থাকে তখন তা কেমন করে বলবো এবং অমুক সত্যটি যখন কেউ শুনতেই প্রস্তুত নয় তখন তা কিভাবে প্রকাশ করবো, এ ধরনের চিন্তা এবং দোদুল্যমানতা তোমার মনে যেন কখনো উদয়ই না হয়। কেউ মানুক বা না মানুক তুমি যা সত্য মনে করবে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে এবং কোন প্রকার কমবেশী না করে তা বলে যেতে থাকবে, পরিণাম আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে।

১৪. এখানে একই যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং একই সংগে তাওহীদের প্রমাণও। এ যুক্তির সার নির্যাস হচ্ছে ঃ

এক ঃ তোমাদের মতে যদি এটা মানুষের বাণী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যি এমন বাণী রচনার ক্ষমতা মানুষের থাকা উচিত। কাজেই তোমরা যখন দাবী করছো, এ কিতাবটি আমি (মুহাম্মাদ) নিজেই রচনা করেছি তখন তোমাদের এ দাবী কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতে পারে যখন তোমরা এমনি ধরনের একটি কিতাব রচনা করে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু বারবার চ্যালেঞ্জ দেবার পরও যদি তোমরা সবাই মিলে এর নজীর পেশ করতে না পারো তাহলে আমার এ দাবী সত্য যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং আল্লাহর জ্ঞান থেকে এটি নাযিল হয়েছে।

দুই ঃ তারপর এ কিতাবে যেহেতু তোমাদের মাবুদদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে, তাদের ইবাদাত বন্দেগী করো না, কারণ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় তাদের কোন অংশ নেই, তাই অবশ্যি তোমাদের মাবুদদেরও (যদি সত্যি তাদের কোন শক্তি থাকে) আমার দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ এবং এ কিতাবের নজীর

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

যারা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে[১৫] তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দিয়ে দেই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। কিন্তু এ ধরনের লোকদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।[১৬] (সেখানে তারা জানতে পারবে) যাকিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে সব বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

পেশ করার ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এ ফায়সালার সময়ও যদি তারা তোমাদের সাহায্য না করে এবং তোমাদের মধ্যে এ কিতাবের নজীর পেশ করার মতো শক্তি সঞ্চার করতে না পারে, তাহলে এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, তোমরা তাদেরকে অযথা তোমাদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। মূলত তাদের মধ্যে কোন শক্তি নেই এবং আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কোন অংশও নেই, যার ভিত্তিতে তারা মাবুদ হবার অধিকার লাভ করতে পারে।

এ আয়াত থেকে আনুষংগিকভাবে একথাও জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা ইউনূসের পূর্বে নাযিল হয়। এখানে দশটি সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়। এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে তারা অক্ষম হলে এরপর সূরা ইউনূসে বলা হয় ঃ ঠিক আছে, তাহলে শুধুমাত্র এরি মতো একটি সূরাই রচনা করে নিয়ে এসো। (ইউনূস, ৩৮ আয়াত, ৪৬ টীকা)

১৫. এখানে যে প্রসংগে ও যে সামঞ্জস্যের পেক্ষিতে একথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সে যুগে যে ধরনের লোকেরা কুরআনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিল এবং আজও প্রত্যাখ্যান করছে তাদের বেশীর ভাগই দুনিয়া পূজারী। বৈষয়িক স্বার্থ তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা যে ওজুহাত দেখায় তা সবই মেকী। আসল কারণ হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও তার বস্তুবাদী স্বার্থের উর্ধে কোন জিনিসের কোন মূল্য নেই এবং এ স্বার্থগুলো থেকে লাভবান হতে হলে তাদের প্রয়োজন লাগামহীন স্বাধীনতা।

১৬. অর্থাৎ যার সামনে রয়েছে শুধু দুনিয়ার এ জীবন এবং এর স্বার্থ ও সুখ-সম্ভোগ লাভ সে এ বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেমন প্রচেষ্টা এখানে চালাবে তেমনি তার ফল সে এখানে পাবে। কিন্তু আখেরাত যখন তার লক্ষ নয় এবং সেজন্য সে কোন চেষ্টাও করেনি তখন তার দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টার ফল লাভ আখেরাত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবার কোন কারণ নেই। সেখানে ফল লাভের সম্ভাবনা একমাত্র তখনই হতে পারে যখন দুনিয়ায় মানুষ এমন সব কাজের জন্য প্রচেষ্টা চালায় যেগুলো আখেরাতেও

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

তারপর যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষের অধিকারী ছিল,[১৭] এরপর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন সাক্ষীও (এ সাক্ষের সমর্থনে) এসে গেছে[১৮] এবং পথপ্রদর্শকও অনুগ্রহ হিসেবে পূর্বে আগত মূসার কিতাবও বর্তমান ছিল (এ অবস্থায় সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া পূজারীদের মতো তা অস্বীকার করতে পারে?) এ ধরনের লোকেরা তো তার প্রতি ঈমান আনবেই,[১৯] আর মানব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে-ই একে অস্বীকার করে তার জন্য যে জায়গার ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে দোযখ। কাজেই হে নবী! তুমি এ জিনিসের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহে পড়ে যেয়ো না, এতো তোমার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো সত্য। তবে বেশীর ভাগ লোক তা স্বীকার করে না।

ফলদায়ক হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কেউ তার নিজের বসবাস করার জন্য একটি সুরম্য প্রাসাদ চায় এবং এখানে এ ধরনের প্রাসাদ তৈরী করার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সবই সে অবলম্বন করে তাহলে নিশ্চয়ই একটি সুরম্য প্রাসাদ তৈরী হয়ে যাবে এবং তার কোন একটি ইঁটও নিছক একজন কাফের তাকে দেয়ালের গায় বসাচ্ছে বলে প্রাসাদের দেয়ালে বসতে অস্বীকার করবে না। কিন্তু মৃত্যুর আগমন এবং জীবনের শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথেই তাকে নিজের এ প্রাসাদ এবং এর সমস্ত সাজসরঞ্জাম এ দুনিয়ায় ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর কোন জিনিসও সে সংগে করে পরলোকে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি সে আখেরাতে প্রাসাদ তৈরী করার জন্য কিছু না করে থাকে তাহলে তার এ প্রাসাদ তার সাথে সেখানে স্থানান্তরিত হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। দুনিয়ায় সে যদি এমন সব কাজে প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে যেগুলোর সাহায্যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী আখেরাতে প্রাসাদ নির্মিত হয় তাহলে একমাত্র তখনই সে ওখানে কোন প্রাসাদ লাভ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ যুক্তি দ্বারা তো শুধু এতটুকুই বুঝা যায় যে, সেখানে সে কোন প্রাসাদ পাবে না। কিন্তু প্রাসাদের পরিবর্তে সে আগুন লাভ করবে, এ কেমন কথা? এর জবাব হচ্ছে (কুরআনই বিভিন্ন সময় এ জবাবটি দিয়েছে) যে ব্যক্তি আখেরাতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য কাজ করে সে অনিবার্য ও স্বাভাবিকভাবে এমন পদ্ধতিতে কাজ করে যার ফলে আখেরাতে প্রাসাদের পরিবর্তে আগুনের কুণ্ড তৈরী হয়। (সূরা ইয়াসীনের ১২ টীকা দেখুন)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে?[২০] এ ধরনের লোকদের তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীরা সাক্ষ দেবে, এরাই নিজেদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করেছিল। শোনো, জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত[২১]—এমন জালেমদের[২২] ওপর যারা আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে বাধা দেয়, সেই পথকে বাঁকা করে দিতে চায়[২৩] এবং আখেরাত অস্বীকার করে।

১৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই নিজের অস্তিত্ব, পৃথিবী ও আকাশের নির্মাণ এবং বিশ্ব–জাহানের শাসন–শৃংখলা বিধানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষলাভ করছিল যে, একমাত্র আল্লাহই এ দুনিয়ার স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক এবং এ সাক্ষ দেখে যার মনে আগে থেকেই বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল যে, এ জীবনের পরে আরো কোন জীবন অবশ্যি হওয়া উচিত যেখানে মানুষ আল্লাহর কাছে তার কাজের হিসাব দেবে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে।

১৮. অর্থাৎ কুরআন এসে এ প্রকৃতিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলো এবং তাকে জানালো তুমি বিশ্বপ্রকৃতিতে ও জীবন ক্ষেত্রে যার নিদর্শন ও পূর্বাভাস পেয়েছো প্রকৃতপক্ষে তাই সত্য।

১৯. বক্তব্যের যে প্রাসংগিক ধারাবাহিকতা চলে এসেছে তার প্রেক্ষিতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো এবং তার আপাত চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্য কুরআনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব ও বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনায় আগে থেকেই তাওহীদ ও আখেরাতের স্পষ্ট সাক্ষ–প্রমাণ পেয়ে আসছিল তারপর কুরআন এসে ঠিক সেই একই কথা বললো, যার সাক্ষ সে ইতিপূর্বে নিজের মধ্যে এবং বাইরেও পাচ্ছিল আর কুরআনের পূর্বে আগত আসমানী কিতাব থেকেও এর পক্ষে আরো সমর্থন পাওয়া গেলো, সে কেমন করে এসব শক্তিশালী সাক্ষ–প্রমাণের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এ অস্বীকারকারীদের সুরে সুর মিলাতে পারে? এ উক্তি থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নাযিলের পূর্বেই ঈমান বিল গাইব–এর মনযিল অতিক্রম করেছিলেন। সূরা আন'আমে যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

—তারা[২৪] পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারতো না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না। তাদেরকে এখন দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে।[২৫] তারা কারোর কথা শুনতেও পারতো না এবং তারা নিজেরা কিছু দেখতেও পেতো না। তারা এমন লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের মনগড়া সবকিছুই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।[২৬] অনিবার্যভাবে আখেরাতে তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

নবী হবার আগেই বিশ্ব–জগতের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে তাওহীদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি এ আয়াত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও চিন্তা–গবেষণার মাধ্যমে এ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। আর এর পর কুরআন এসে কেবল এর সত্যতা প্রমাণ এবং একে সুদৃঢ়ই করেনি বরং তাঁকে সরাসরি সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও দান করেছে।

২০. আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর বন্দেগী লাভ করার অধিকারে অন্যকে শরীক করার কথা বলে। অথবা একথা বলে যে, নিজের বান্দাদের হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর কোন আগ্রহ নেই এবং তিনি আমাদের পথ দেখাবার জন্য কোন কিতাব ও কোন নবী পাঠাননি। বরং তিনি আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন, যেভাবে ইচ্ছা আমরা আমাদের জীবন যাপন করতে পারি। অথবা বলে, আল্লাহ এমনি খেলাচ্ছলে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেভাবে আমাদের খতমও করে দেবেন। তাঁর সামনে আমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কাজেই আমাদের কোন পুরস্কার বা শাস্তিও লাভ করতে হবে না।

২১. এটা হচ্ছে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা। সেখানে এ ঘোষণা দেয়া হবে।

২২. এটা প্রসংগক্রমে মাঝখানে বলা একটা বাক্য। যেসব জালেমের ওপর পরকালে আল্লাহর লানতের কথা ঘোষণা করা হবে তারা হবে এমনসব লোক যারা আজ দুনিয়ায় এ ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ তাদের সামনে এই যে সোজা পথ পেশ করা হচ্ছে এ পথ তারা পছন্দ করে না। তারা চায় এ পথ যদি তাদের মানসিক প্রবৃত্তি এবং তাদের জাহেলী স্বার্থ–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

তবে যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে।[২৭] এ দল দু'টির উপমা হচ্ছে ঃ যেমন একজন লোক অন্ধ ও বধির এবং অন্যজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন। এরা দু'জন কি সমান হতে পারে? তোমরা (এ উপমা থেকে) কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না?

প্রীতি–বিদ্বেষ ও তাদের ধারণা–কল্পনা অনুযায়ী বাঁকা হয়ে যায় তাহলেই তারা তা গ্রহণ করবে।

২৪. এখানে আবার আখেরাতের জীবনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

২৫. একটি আযাব হবে নিজের গোমরাহ হবার জন্য এবং আর একটি আযাব হবে অন্যদেরকে গোমরাহ করার এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য গোমরাহীর উত্তরাধিকার রেখে যাবার জন্য। (দেখুন সূরা আরাফের ৩০ টীকা)

২৬. অর্থাৎ তারা আল্লাহ, বিশ্ব–জগত এবং নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব মতবাদ তৈরী করে নিয়েছিল তা সবই ভিত্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের উপাস্য, সুপারিশকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের ওপর যেসব আস্থা স্থাপন করেছিল সেগুলোও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যেসব চিন্তা–অনুমান করে রেখেছিল তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

২৭. এখানে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা খতম হয়ে গেছে।

২৮. অর্থাৎ এ দু'জনের কাজের ধারা এবং সবশেষে এদের পরিণাম কি এক রকম হতে পারে? যে ব্যক্তি নিজেই পথ দেখে না এবং এমন কোন লোকের কথাও শোনে না, যে তাকে পথের কথা বলছে, সে নিশ্চয়ই কোথাও ধাক্কা খাবে এবং মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজে পথ দেখতে পাচ্ছে এবং কোন পথের সন্ধান জানা লোকের পথনির্দেশনারও সাহায্য গ্রহণ করেছে সে নিশ্চয়ই নিরাপদে নিজের মনযিলে পৌঁছে যাবে। উল্লেখিত দু'জন লোকের মধ্যেও এ একই পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। তাদের একজন স্বচক্ষেও বিশ্ব–জগতে মহা সত্যের নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাহর পাঠানো পথপ্রদর্শকদের কথাও শোনে আর অন্য জন আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখার জন্য নিজের চোখ খোলা রাখে না এবং নবীদের কথাও শোনে না। জীবনক্ষেত্রে এদের উভয়ের কার্যধারা এক রকম হবে কেমন করে? তারপর তাদের পরিণামের মধ্যে পার্থক্যই বা হবে না কেন?

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٥﴾ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

৩ রুকূ'

(আর এমনি অবস্থা ছিল যখন) আমি নূহকে তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম।[২৯] (সে বললোঃ) "আমি তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করো না। নয়তো আমার আশংকা হচ্ছে তোমাদের ওপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে।"[৩০] জবাবে সেই কওমের সরদাররা, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল, বললো : "আমাদের দৃষ্টিতে তুমি তো ব্যস আমাদের মতো একজন মানুষ বৈ আর কিছুই নও।[৩১] আর আমরা তো দেখছি আমাদের সমাজের মধ্যে যারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিম্নশ্রেণীর ছিল তারাই কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করে তোমার অনুসরণ করেছে।[৩২] আমরা এমন কোন জিনিসও দেখছি না যাতে তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী আছো।[৩৩] বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।"

২৯. এ প্রসংগে সূরা আরাফের ৮ রুকূ'র টীকাগুলো সামনে রাখলে ভালো হয়।

৩০. এ সূরার শুরুতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখেও এ এক কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

৩১. মক্কার লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে মূর্খ জনোচিত আপত্তি উত্থাপন করতো এখানেও সেই একই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদেরই মতো একজন মামুলি পর্যায়ের লোক, খায় দায়, চলাফেরা করে, ঘুমায় আবার জেগে থাকে, ছেলেমেয়ের বাপ হয়, তাকে আমরা কেমন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত হয়ে এসেছেন বলে মেনে নিতে পারি? (দেখুন সূরা ইয়াসীন, ১১ টীকা)

৩২. মক্কার বড় বড় ও উঁচু শ্রেণীর লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে কথা বলতো এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তারা বলতো, এর সাথে কারা আছে? ক'জন মাথাগরম ছোকরা, যাদের দুনিয়ার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿۲۸﴾ وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۹﴾

সে বললো, " হে আমার কওম! একটু ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট সাক্ষ-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি এবং তারপর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ রহমত দান করে থাকেন[৩৪] কিন্তু তা তোমাদের নজরে পড়েনি, তাহলে আমার কাছে এমন কি উপায় আছে যার সাহায্যে তোমরা মানতে না চাইলেও আমি জবরদস্তি তোমাদের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিবো? হে আমার কওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাচ্ছি না।[৩৫] আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর যারা আমার কথা মেনে নিয়েছে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের রবের কাছে যাবে।[৩৬] কিন্তু আমি দেখছি তোমরা মূর্খতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছ।

অথবা কয়েকজন গোলাম এবং নিম্ন শ্রেণীর কিছু সাধারণ মানুষ, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই এবং বিশ্বাসের দিক দিয়েও কমজোর। (দেখুন সূরা আন'আম ৩৪-৩৭ টীকা এবং সূরা ইউনূস ৭৮ টীকা)।

৩৩. অর্থাৎ তোমরা বলে থাকো, আমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত এবং যারা আমাদের পথ অবলম্বন করেনি তারা আল্লাহর গযবের সম্মুখীন হয়েছে। তোমাদের এসব কথার কোন আলামত আমাদের নজরে পড়ে না। অনুগ্রহ যদি হয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের প্রতি হয়েছে। কারণ আমরা ধন-দৌলত ও শান-শওকতের অধিকারী এবং একটি বিরাট জনগোষ্ঠী আমাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে তোমরা কপর্দক শূন্য দেউলিয়ার দল, কোন্ বিষয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছো? তোমাদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করা হবে কেন?

৩৪. আগের রুকূ'তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে যে কথা উচ্চারিত হয়েছে এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথমে আমি বিশ্ব-জাহান ও মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে তাওহীদের মূল তত্ত্বে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তারপর আল্লাহ তাঁর নিজের রহমতের (অর্থাৎ অহী) মাধ্যমে আমাকে সরাসরি

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ښ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

আর হে আমার কওম! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? তোমরা কি এতটুকু কথাও বোঝ না? আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। একথাও বলি না যে, আমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি এবং আমি ফেরেশ্‌তা এ দাবীও করি না।[৩৭] আর আমি একথাও বলতে পারি না যে, তোমরা যাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো তাদেরকে আল্লাহ কখনো কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। যদি আমি এমনটি বলি তাহলে আমি হবো জালেম"।

এ সত্যগুলোর জ্ঞান দান করেছেন। আমার মন ইতিপূর্বেই এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়ে আসছিল। এ থেকে এও জানা যায় যে, নবুওয়াত লাভ করার আগেই সকল নবী অনুসন্ধান ও চিন্তা–গবেষণার মাধ্যমে ঈমান বিল গাইব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস লাভ করে থাকেন। তারপর মহান আল্লাহ নবুওয়াতের মর্যাদা দান করার সময় তাঁদেরকে ঈমান বিশ্ শাহাদাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন লব্ধ বিশ্বাস দান করে থাকেন।

৩৫. আমি একজন নিস্বার্থ উপদেশদাতা। নিজের কোন লাভের জন্য নয় বরং তোমাদেরই ভালোর জন্য এত কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ–কষ্ট সহ্য করছি। এ সত্যের দাওয়াত দেবার, এর জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করার ও বিপদ–মুসিবতের সম্মুখীন হবার পেছনে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সক্রিয় আছে এমন কথা তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না। (দেখুন আল মুমিনূন ৭০ টীকা, ইয়াসীন ১৭ টীকা, আশ শূরা ৪১ টীকা)।

৩৬. অর্থাৎ তাদের রবই তাদের মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। তাঁর সামনে যাবার পরই তাদের সবকিছু প্রকাশিত হবে। তারা যদি সত্যিকার মহামূল্যবান রত্ন হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ছুঁড়ে ফেলার কারণে তারা তুচ্ছ মূল্যহীন পাথরে পরিণত হয়ে যাবে না। আর যদি তারা মূল্যহীন পাথরই হয়ে থাকে তাহলে তাদের মালিকের ইচ্ছা, তিনি তাদেরকে যেখানে চান ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। (দেখুন সূরা আন'আম ৫২ আয়াত এবং সূরা কাহাফ ২৮ আয়াত)।

৩৭. বিরোধী পক্ষ তাঁর ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, তোমাকে তো আমরা আমাদেরই মত একজন মানুষ দেখছি। তাদের আপত্তির জবাবে একথা বলা হয়েছিল। এখানে

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۝ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

শেষ পর্যন্ত তারা বললো, " হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছো, অনেক ঝগড়া করেছো, যদি সত্যবাদী হও তাহলে এখন আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো।" নূহ জবাব দিল, "তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান এবং তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখন যদি আমি তোমাদের কিছু মংগল করতে চাইও তাহলে আমার মংগলাকাংখা তোমাদের কোন কাজে লাগবে না যখন আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার এরাদা করে ফেলেছেন।[৩৮] তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

হযরত নূহ (আ) বলেন, যথার্থই আমি একজন মানুষ। একজন মানুষ হওয়া ছাড়া নিজের ব্যাপারে তো আমি আর কিছুই দাবী করিনি। তাহলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ আপত্তি উঠাচ্ছো কেন? আমি শুধু এতটুকুই দাবী করি যে, আল্লাহ আমাকে জ্ঞান ও কর্মের সহজ সোজা পথ দেখিয়েছেন। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা এ ব্যাপারটির পরীক্ষা করে নাও। কিন্তু এ দাবীর ব্যাপারটি পরীক্ষা করার এ কোন্ ধরনের পদ্ধতি যে, কখনো তোমরা আমার কাছে গায়েবের খবর জিজ্ঞেস করো, কখনো এমন ধরনের অদ্ভুত দাবী উথাপন করতে থাকো যাতে মনে হয় যেন আল্লাহর ভাণ্ডারের সমস্ত চাবী আমার কাছে আছে আবার কখনো আপত্তি করতে থাকো যে, আমি মানুষের মতো আহার-বিহার করি কেন? যেন মনে হয় আমি ফেরেশতা হবার দাবী করেছিলাম। যে ব্যক্তি আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপারে সঠিক পথের দিশা দেবার দাবী করেছে তাকে এ জিনিসগুলোর ব্যাপারে যে কোন প্রশ্ন চাও করতে পারো। কিন্তু তোমরা দেখি অদ্ভুত লোক। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করছো অমুকের মোষের নর-বাচ্চা হবে না মাদী-বাচ্চা? প্রশ্ন হলো মানুষের জীবনের জন্য সঠিক নৈতিক ও তামাদ্দুনিক নীতি বর্ণনা করার সাথে মোষের বাচ্চা প্রসব করার কোন সম্পর্ক আছে কি? (দেখুন সূরা আনআম, ৩১ ও ৩২ টীকা)

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দুর্মতি এবং সদাচারে আগ্রহহীনতা দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে চাও সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

হে মুহাম্মাদ ! এরা কি একথা বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই সবকিছু রচনা করেছে ? ওদেরকে বলে দাও, "যদি আমি নিজে এসব রচনা করে থাকি, তাহলে আমার অপরাধের দায়-দায়িত্ব আমার। আর যে অপরাধ তোমরা করে যাচ্ছো তার জন্য আমি দায়ী নই।"৩৯

দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না।

৩৯. বক্তব্যের ধরন থেকে মনে হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে হযরত নূহের (আ) এ কাহিনী শুনে বিরোধীরা আপত্তি করে থাকবে যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের ওপর প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নিজেই এ কাহিনী বানিয়ে পেশ করছে। যেসব আঘাত সে সরাসরি আমাদের ওপর করতে চায় না সেগুলোর জন্য সে একটি কাহিনী তৈরী করেছে এবং এভাবে "ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো"র মতো আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ভেংগে এ বাক্যে তাদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

আসলে হীনমনা লোকদের দৃষ্টি সবসময় কোন বিষয়ের খারাপ দিকের প্রতিই পড়ে থাকে। ভালোর প্রতি তাদের কোন আগ্রহ না থাকায় ভালো দিকের প্রতি তাদের দৃষ্টিই যায় না। কোন ব্যক্তি যদি তোমাদের কোন জ্ঞানের কথা বলে থাকে অথবা কোন সুশিক্ষা দিতে থাকে কিংবা তোমাদের কোন ভুলের দরুন তোমাদের সতর্ক করে, তাহলে তা থেকে ফায়দা হাসিল করো এবং নিজেদের সংশোধন করে নাও। কিন্তু হীন লোকেরা সবসময় তার মধ্যে দুষ্কৃতির এমন কোন বিষয় খুঁজবে যার ফলে জ্ঞান ও উপদেশ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরা কেবল দুষ্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিতই থাকবে না বরং বক্তার গায়েও কিছু দুষ্কৃতির ছাপ লাগিয়ে দেবে। সর্বোত্তম উপদেশও নষ্ট করে দেয়া যেতে পারে যদি শ্রোতা তাকে কল্যাণকামিতার পরিবর্তে "আঘাত" করার অর্থে গ্রহণ করে এবং সে মানসিকভাবে নিজের ভুল উপলব্ধি ও অনুভব করার পরিবর্তে কেবল বিরূপ মনোভাবই পোষণ করতে থাকে। তারপর এ ধরনের লোকেরা হামেশা নিজেদের চিন্তার ভিত্ গড়ে তোলে একটি মৌলিক কুধারণার ওপর। কোন একটি বক্তব্য নিরেট সত্য অথবা স্রেফ একটি বানোয়াট কাহিনী উভয়ই হতে পারে। এ উভয় রকমের সম্ভাবনা যেখানে সমান সমান, সেখানে বক্তব্যটি যদি কারোর অবস্থার সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায় এবং তাতে তার কোন ভুলের প্রতি অংগুলি নির্দেশ থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে তাকে একটি যথার্থ সত্য কথা মনে করে তার শিক্ষণীয় দিক থেকে ফায়দা হাসিল করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রকার সাক্ষ-প্রমাণ ছাড়াই এ মর্মে দোষারোপ করে যে, বক্তা নিছক তার ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য এ মনগড়া কাহিনী রচনা করেছে তাহলে সে হবে নেহাতই একজন কুধারণা পোষক ও বক্র দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি।

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৪ রুকূ'

নূহের প্রতি অহী নাযিল করা হলো এ মর্মে যে, তোমার কওমের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া এখন আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করা পরিহার করো এবং আমার তত্ত্বাবধানে আমার অহী অনুযায়ী একটি নৌকা বানানো শুরু করে দাও। আর দেখো যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করো না, এরা সবাই এখন ডুবে যাবে।[৪০]

নূহ যখন নৌকা নির্মাণ করছিল তখন তার কওমের সরদারদের মধ্য থেকে যারাই তার কাছ দিয়ে যেতো তারাই তাকে উপহাস করতো। সে বললো, "যদি তোমরা আমাকে উপহাস করো তাহলে আমিও তোমাদের উপহাস করছি। শিগ্‌গীর তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব নাযিল হবে এবং কার ওপর এমন আযাব নাযিল হবে যা ঠেকাতে চাইলেও ঠেকানো যাবে না।[৪১]

এ কারণে বলা হয়েছে, যদি আমি এ কাহিনী তৈরী করে থাকি তাহলে আমার অপরাধের জন্য আমি দায়ী কিন্তু তোমরা যে অপরাধ করছো তা তো যথাস্থানে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তার জন্য আমি নই, তোমরাই দায়ী হবে এবং তোমরাই পাকড়াও হবে।

৪০. এ থেকে জানা যায়, কোন জাতির কাছে যখন নবীর পয়গাম পৌঁছে যায় তখন সে কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত অবকাশ পায় যতক্ষণ তার মধ্যে কিছু সৎ ব্যক্তির বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন তার সমস্ত সত্যনিষ্ঠ লোক বের হয়ে যায় এবং সেখানে কেবল অসৎ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যায় তখন আল্লাহ সেই জাতিকে আর অবকাশ দেন না। তখন তার রহমতই দাবী জানাতে থাকে যে, পঁচা ফলের

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمۡرُنَا وَفَارَ التَّنُّوۡرُ ۙ قُلۡنَا احۡمِلۡ فِيۡهَا مِنۡ كُلٍّ زَوۡجَيۡنِ اثۡنَيۡنِ وَاَهۡلَكَ اِلَّا مَنۡ سَبَقَ عَلَيۡهِ الۡقَوۡلُ وَمَنۡ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيۡلٌ ۝٤٠

অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো[৪২] তখন আমি বললাম, "সব ধরনের প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নাও। নিজের পরিবারবর্গকেও—তবে তাদের ছাড়া যাদেরকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে[৪৩] —এতে তুলে নাও এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এতে বসাও।"[৪৪] তবে সামান্য সংখ্যক লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছিল।

ঝুড়ি সদৃশ ঐ জাতিটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়া হোক যাতে তা ভালো ফলগুলোকেও নষ্ট না করে দেয়। এ অবস্থায় তার প্রতি সদয় হওয়া আসলে সারা দুনিয়াবাসী এবং এ সংগে ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতিও নির্দয় আচরণ করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

৪১. এটি একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার বাইরের চেহারা দেখে কেমন প্রতারিত হয়। যখন নূহ আলাইহিস সালাম সাগর থেকে অনেক দূরে শুকনো স্থলভূমির ওপর নিজের জাহাজটি নির্মাণ করছিলেন তখন যথার্থই লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর এ কাজটি অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়ে থাকবে এবং তারা হয়তো হাসতে হাসতে বলে থাকবে, "মিয়া সাহেবের পাগলামী শেষ পর্যন্ত এতদূর পৌঁছে গেছে যে, এবার তিনি শুকনো ডাংগায় জাহাজ চালাবেন।" সেদিন তাদের কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, কয়েকদিন পরে সত্যিই এখানে জাহাজ চলবে। তারা এ কাজটিকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের মস্তিষ্ক বিকৃতির একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ গণ্য করে থাকবে এবং পরস্পরকে বলে থাকবে, যদি ইতিপূর্বে এ ব্যক্তির পাগলামির ব্যাপারে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে এবার নিজের চোখে দেখে নাও কি কাণ্ডটা সে এখন করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য ব্যাপার জানতো এবং আগামীকাল এখানে জাহাজের কি রকম প্রয়োজন হবে একথা যার জানা ছিল সে উল্টো তাদের অজ্ঞতা ও প্রকৃত ব্যাপার না জানা এবং তদুপরি তাদের বোকার মতো নিশ্চিন্ত থাকার ব্যাপারটি নিয়ে নিশ্চয়ই হেসে থাকবে।

সে নিশ্চয়ই বলে থাকবে "কত বড় অজ্ঞ নাদান এ লোকগুলো, এদের মাথার ওপর উদ্যত মৃত্যুর খড়্গ, আমি এদেরকে সাবধানও করে দিলাম যে, সেই খড়্গ মাথার ওপর পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং এরপর এদের চোখের সামনেই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি নিজেও প্রস্তুতি গ্রহণ করছি কিন্তু এরা নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে এবং উলটো আমাকেই পাগল মনে করছে। এ বিষয়টিকে যদি একটু বিস্তারিতভাবে ভেবে দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, দুনিয়ায় বাহ্যিক ও স্থূল জ্ঞানের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতার যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় তা প্রকৃত ও যথার্থ সত্য জ্ঞানের আলোকে নির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায়

কত বেশী ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি দেখে, সে যে জিনিসটিকে চরম বুদ্ধিমত্তা মনে করে, প্রকৃত সত্যদর্শীর চোখে তা হয় চরম নির্বুদ্ধিতা। অন্যদিকে বাহ্যদর্শীর চোখে যে জিনিসটি একেবারেই অর্থহীন, পুরোপুরি পাগলামি ও নেহাত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়, সত্যদর্শীর কাছে তা–ই পরম জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও গুরুত্বের অধিকারী এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ দাবী হিসেবে পরিগণিত হয়।

৪২. এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায় সেটিকেই আমরা সঠিক মনে করি। কুরআনের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, প্লাবনের সূচনা হয় একটি বিশেষ চুলা থেকে। তার তলা থেকে পানির স্রোত বের হয়ে আসে। তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুশল ধারে বৃষ্টি হতে থাকে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় মাটি ফুঁড়ে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে থাকে। এখানে কেবল চুলা থেকে পানি উথলে ওঠার কথা বলা হয়েছে এবং সামনের দিকে গিয়ে বৃষ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সূরা 'কামারে' এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ -

"আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম। এর ফলে অনবরত বৃষ্টি পড়তে লাগলো। মাটিতে ফাটল সৃষ্টি করলাম। ফলে চারদিকে পানির ফোয়ারা বের হতে লাগলো। আর যে কাজটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ দু' ধরনের পানি তা পূর্ণ করার জন্য পাওয়া গেলো।"

তাছাড়া "তান্নূর" (চুলা) শব্দটির ওপর আলিফ–লাম বসানোর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয় যে, একটি বিশেষ চুলাকে আল্লাহ এ কাজ শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই চুলাটির তলা ঠিক সময়মতো ফেটে পানি উথলে ওঠে। পরে এ চুলাটিই প্লাবনের চুলা হিসেবে পরিচিত হয়। সূরা মুমিনূনের ২৭ আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, এ চুলাটির কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছিল।

৪৩. অর্থাৎ তোমার পরিবারের যেসব লোকের কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফের এবং আল্লাহর রহমতের অধিকারী নয় তাদেরকে নৌকায় ওঠাবে না। সম্ভবত এরা ছিল দু'জন। একজন ছিল হযরত নূহের (আ) ছেলে। তার ডুবে যাওয়ার কথা সামনেই এসে যাচ্ছে। অন্যজন ছিল হযরত নূহের (আ) স্ত্রী। সূরা তাহরীমে এর আলোচনা এসেছে। সম্ভবত পরিবারের অন্যান্য লোকজনও এ তালিকার অন্তরভূক্ত হতে পারে। কিন্তু কুরআনে তাদের নাম নেই।

৪৪. যেসব ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী সমগ্র মানবজাতির বংশধারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তিন ছেলের সাথে সংযুক্ত করেন, এখান থেকে তাদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আসলে ইসরাঈলী পৌরাণিক বর্ণনাগুলো এ বিভ্রান্তির উৎস। সেখানে বলা হয়েছে যে, নূহের প্লাবনের হাত থেকে হযরত নূহ (আ) ও তার তিন ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾ وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ ۣ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاٰوِىْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

নূহ বললো, "এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামেই এটা চলবে এবং থামবে। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[৪৫]

নৌকা তাদেরকে নিয়ে পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ভেসে চলতে লাগলো। নূহের ছেলে ছিল তাদের থেকে দূরে। নূহ চীৎকার করে তাকে বললো, "হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফেরদের সাথে থেকো না।" সে পালটা জবাব দিল, "আমি এখনই একটি পাহাড়ে চড়ে বসছি। তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে।" নূহ বললো, "আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচাবার কেউ নেই, তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন সে ছাড়া।" এমন সময় একটি তরংগ উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে গেলো এবং সেও নিমজ্জিতদের দলে শামিল হলো।

ছাড়া আর কেউ রক্ষা পায়নি (দেখুন বাইবেল, আদি পুস্তক ৬ঃ১৮, ৭ঃ৭, ৯ঃ১ এবং ৯ঃ১৯)। কিন্তু কুরআনের বহু জায়গায় একথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত নূহের পরিবার ছাড়া তাঁর কওমের বেশ কিছুসংখ্যক লোককেও, তাঁদের সংখ্যা সামান্য হলেও আল্লাহ প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া কুরআন পরবর্তী মানব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র নূহের বংশধর নয় বরং তাঁর সাথে নৌকায় যেসব লোককে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন তাদের সবার বংশধর গণ্য করেছে। বলা হয়েছে ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ

"যাদেরকে আমি নৌকায় নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের বংশধর।"

(বনী ইসরাঈল ৩)

مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ

وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾

হুকুম হলো, " হে পৃথিবী! তোমার সমস্ত পানি গিলে ফেলো এবং হে আকাশ। থেমে যাও।" সে মতে পানি ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেলো, ফায়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হলো এবং নৌকা জুদীর ওপর থেমে গেলো[৪৬] তারপর বলে দেয়া হলো, জালেম সম্প্রদায় দূর হয়ে গেলো!

"আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে এবং নূহের সাথে যাদেরকে আমি নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের মধ্য থেকে।" (মারয়াম, ৫৮ আয়াত)

৪৫. এ হলো মুমিনের সত্যিকার পরিচয়। কার্যকারণের এ জগতে সে অন্যান্য দুনিয়াবাসীর ন্যায় প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সমস্ত উপায় ও কলাকৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সে উপায় ও কলা–কৌশলের ওপর ভরসা করে না। ভরসা করে একমাত্র আল্লাহর ওপর। সে খুব ভালো করেই জানে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়া ও করুণা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে যুক্ত না হলে তার কোন উপায় ও কলাকৌশল শুরুও হতে পারে না, ঠিকমতো চলতেও পারে না, আর চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছুতেও পারে না।

৪৬. জুদী পাহাড়টি কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইবনে উমর দ্বীপের উত্তর–পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাইবেলে উল্লেখিত নৌকার অবস্থান স্থলের নাম আরারত বলা হয়েছে। এটি আর্মেনিয়ার একটি পাহাড়েরও নাম এবং একটি পাহাড় শ্রেণীর নামও। পাহাড় শ্রেণী বলতে যে আরারতের কথা বলা হয়েছে সেটি আর্মেনিয়ার উচ্চ মালভূমি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কুর্দিস্তান পর্যন্ত চলে গেছে। এ পাহাড় শ্রেণীর একটি পাহাড়ের নাম জুদী পাহাড়। আজো এ পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাকেই নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে বেরাসাস (BERASUS) নামে ব্যবিলনের একজন ধর্মীয় নেতা পুরাতন কুলদানী বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের দেশের যে ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি জুদী নামক স্থানকেই নূহের নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করেন। এরিস্টটলের শিষ্য এবিডেনাস (ABYDENUS) ও নিজের ইতিহাসগ্রন্থে একথা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজের সময়ের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকে বহু লোকের কাছে এ নৌকার অংশ বিশেষ রয়েছে। সেসব ধুয়ে তারা রোগ নিরাময়ের জন্য রোগীদের পান করায়।

এখানে যে প্লাবনের কথা বলা হয়েছে সেটি কি সারা পৃথিবীব্যাপী ছিল অথবা যে এলাকায় নূহের সম্প্রদায়ের অধিবাস ছিল কেবল সেই এলাকাভিত্তিক ছিল? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার মীমাংসা আজো হয়নি। ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর কারণে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এ প্লাবন এসেছিল সারা দুনিয়া জুড়ে–(আদিপুস্তক ৭ঃ১৮–২৪)। কিন্তু কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি। কুরআনের ইংগিতসমূহ থেকে অবশ্যি একথা জানা যায় যে, নূহের প্লাবন থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল পরবর্তী মানব বংশ তাদেরই আওলাদ।

কওমে নূহ–এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

কিন্তু এথেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, প্লাবন সারা দুনিয়া জুড়ে এসেছিল। কেননা একথা এভাবেও সত্য হতে পারে যে, সে সময় দুনিয়ার যে অংশ জুড়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল প্লাবন সে অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্লাবনের পরে মানুষের যে বংশধারার উন্মেষ ঘটেছিল তারাই ধীরে ধীরে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ মতবাদের সমর্থন দু'টি জিনিস থেকে পাওয়া যায়। এক, ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও মৃত্তিকাস্তরের ভূ–তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দাজলা ও ফোরাত বিধৌত এলাকায় একটি মহাপ্লাবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমস্ত অংশ জুড়ে কোন এক সময়

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ
اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّىْۤ اَعِظُكَ
اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ
مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

নূহ তার রবকে ডাকলো। বললো, "হে আমার রব! আমার ছেলে আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য[৪৭] আর তুমি সমস্ত শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উত্তম শাসক।"[৪৮] জবাবে বলা হলো, "হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মপরায়ণ।[৪৯] কাজেই তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করো না যার প্রকৃত তত্ত্ব তোমার জানা নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে অজ্ঞদের মতো বানিয়ে ফেলো না।"[৫০] নূহ তখনই বললো, "হে আমার রব! যে জিনিসের ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই তা তোমার কাছে চাইবো— এ থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে মাফ না করো এবং আমার প্রতি রহম না করো তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।"[৫১]

একটি মহাপ্লাবন হয়েছিল এমন কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুই, সারা দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটি মহাপ্লাবনের কাহিনী শ্রুত হয়ে আসছে। এমন কি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও নিউগিনির মতো দূরবর্তী দেশগুলোর পুরাকালের কাহিনীতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন এক সময় এসব জাতির পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর একই ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিল এবং তখন সেখানেই এ মহাপ্লাবন এসেছিল। তারপর যখন তাদের বংশধররা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এ ঘটনার কাহিনীও তারা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪৭ টীকা)

৪৭. অর্থাৎ তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমার পরিজনদেরকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। এখন ছেলে তো আমার পরিজনদের অন্তরভুক্ত। কাজেই তাকেও রক্ষা করো।

৪৮. অর্থাৎ তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এরপর আর কোন আবেদন নিবেদন খাটবে না। আর তুমি নির্ভেজাল জ্ঞান ও পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকো।

৪৯. ব্যাপারটা ঠিক এ রকম, যেমন এক ব্যক্তির শরীরের কোন একটা অংশ পচে গেছে। ডাক্তার অংগটি কেটে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন রোগী ডাক্তারকে

বলছে, এটা তো আমার শরীরের একটা অংশ, আপনি কেটে ফেলে দেবেন? ডাক্তার জবাবে বলেন, এটা তোমার শরীরের অংশ নয়। কারণ এটা পচে গেছে। এ জবাবের অর্থ কখনো এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে এ অংগটির শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বরং এর অর্থ হবে, তোমার শরীরের জন্য সুস্থ ও কার্যকর অংগের প্রয়োজন, পচা অংগের নয়। কারণ পচা অংগ একদিকে যেমন শরীরের কোন কাজে আসে না তেমনি অন্যদিকে বাদবাকি সমস্ত শরীরটাকেও নষ্ট করে দেয়। কাজেই যে অংগটি পচে গেছে সেটি আর এ অর্থে তোমার শরীরের কোন অংশ নয় যে অর্থে শরীরের সাথে অংগের সম্পর্কের প্রয়োজন হয়। ঠিক এমনিভাবেই একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ পিতাকে যখন একথা বলা হয় যে, এ ছেলেটি তোমার পরিজনদের অন্তরভুক্ত নয়, কারণ চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন এর অর্থ এ হয় না যে, এর মাধ্যমে তার ছেলে হবার বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে বরং এর অর্থ শুধু এতটুকুই হয় যে, বিকৃত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোক তোমার সৎ পরিবারের সদস্য হতে পারে না। সে তোমার রক্ত সম্পর্কীয় পরিবারের একজন সদস্য হতে পারে কিন্তু তোমার নৈতিক পরিবারের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর আজ যে বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে সেটি বংশগত বা জাতি–গোষ্ঠীগত কোন বিরোধের ব্যাপার নয়। এক বংশের লোকদের রক্ষা করা হবে এবং অন্য বংশের লোকদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এটি হচ্ছে কুফরী ও ঈমানের বিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার। এখানে শুধুমাত্র যারা সৎ তাদেরকে রক্ষা করা হবে এবং যারা অসৎ ও নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে খতম করে দেয়া হবে।

ছেলেকে অসৎকর্ম পরায়ণ বলে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা সন্তানকে ভালোবাসে ও লালন করে শুধু এজন্য যে, তারা তাদের পেটে বা ঔরসে জন্ম নিয়েছে এবং তাদের সাথে তাদের রক্ত সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারটি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মুমিনের দৃষ্টি হতে হবে সত্যের প্রতি নিবদ্ধ। তাকে তো ছেলেমেয়েদেরকে এ দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, এরা আল্লাহর সৃষ্ট কতিপয় মানুষ। প্রাকৃতিক নিয়মে আল্লাহ এদেরকে তার হাতে সোপর্দ করেছেন। এদেরকে লালন–পালন করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরী করতে হবে। এখন তার যাবতীয় পরিশ্রম ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও তার ঘরে জন্ম নেয়া কোন ব্যক্তি যদি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরী হতে না পারে এবং যিনি তাকে মুমিন বাপের হাতে সোপর্দ করেছিলেন নিজের সেই রবেরই বিশ্বস্ত খাদেম হতে না পারে, তাহলে সেই বাপকে অবশ্যি বুঝতে হবে যে, তার সমস্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এরপর এ ধরনের ছেলে–মেয়েদের সাথে তার মানসিক যোগ থাকার কোন কারণই থাকতে পারে না।

তারপর সংসারের সবচেয়ে প্রিয় ছেলেমেয়েদের ব্যাপারটি যখন এই তখন অন্যান্য আত্মীয়–স্বজনদের ব্যাপারে মুমিনের দৃষ্টিভংগী যাকিছু হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঈমান একটি চিন্তাগত ও নৈতিক গুণ। এ গুণের প্রেক্ষিতেই মুমিনকে মুমিন বলা হয়। মুমিন হওয়ার দিক দিয়ে অন্য মানুষের সাথে তার নৈতিক ও ঈমানী সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই। রক্ত–মাংসের সম্পর্কযুক্ত কেউ যদি তার সাথে এ গুণের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত হয় তাহলে নিসন্দেহে সে তার আত্মীয়। কিন্তু যদি সে এ গুণ শূন্য হয়

قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

হুকুম হলো, "হে নূহ! নেমে যাও,[৫২] আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বরকত তোমার ওপর এবং তোমার সাথে যেসব সম্প্রদায় আছে তাদের ওপর। আবার কিছু সম্প্রদায় এমনও আছে যাদেরকে আমি কিছুকাল জীবন উপকরণ দান করবো তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

তাহলে মুমিন শুধুমাত্র রক্তমাংসের দিক দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রাখবে। তার হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক তার সাথে হতে পারে না। আর ঈমান ও কুফরীর বিরোধের ক্ষেত্রে যদি সে তার মুখোমুখি দাঁড়ায় তাহলে এ অবস্থায় সে এবং একজন অপরিচিত কাফের তার চোখে সমান হয়ে দেখা দেবে।

৫০. এ উক্তি দেখে কারো এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, হযরত নূহের (আ) মধ্যে ঈমানী চেতনার অভাব ছিল অথবা তাঁর ঈমানে জাহেলিয়াতের কোন গন্ধ ছিল। আসল কথা হচ্ছে, নবীগণও মানুষ। আর মুমিনের পূর্ণতার জন্য যে সর্বোচ্চ মানদণ্ড কায়েম করা হয়েছে সর্বক্ষণ তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে থাকা কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কোন কোন সময় কোন নাজুক মনস্তাত্বিক অবস্থায় নবীর মতো উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন লোকও মুহূর্তকালের জন্য হলেও নিজের মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাস্ত হন। কিন্তু যখনই তিনি অনুভব করেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয় যে, তিনি কাংখিত মানের নিচে নেমে যাচ্ছেন তখনই তিনি তাওবা করেন এবং নিজের ভুলের সংশোধন করে নেবার ব্যাপারে এক মুহূর্তও ইতস্তত করেন না। হযরত নূহের নৈতিক উচ্চমানের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, জওয়ান ছেলেকে চোখের সামনে ডুবে যেতে দেখছেন! এ দৃশ্য দেখে তাঁর কলিজা ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে। কিন্তু যখনই আল্লাহ সাবধান করে জানিয়ে দেন, যে ছেলে হককে ত্যাগ করে বাতিলের সহযোগী হয়েছে তাকে নিছক তোমার ঔরসজাত বলেই নিজের ছেলে মনে করা একটি জাহেলী ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তিনি নিজের মানসিক আঘাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে ইসলামের কাংখিত চিন্তা ও ভাবধারার দিকে ফিরে আসেন।

৫১. নূহের ছেলের এ ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে তাঁর ইনসাফ যে কি পরিমাণ পক্ষপাতহীন এবং তাঁর ফায়সালা যে কত চূড়ান্ত হয়ে থাকে তা বলেছেন। মক্কার মুশরিকরা মনে করতো, আমরা যাই করি না কেন আমাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হতে পারে না। কারণ আমরা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওলাদ এবং বড় বড় দেবদেবীর ভক্ত। ইহুদী ও খৃষ্টানরাও এমনি ধরনের কিছু ধারণা পোষণ করতো এবং এখনো পোষণ করে থাকে। অনেক ভ্রষ্টাচারী মুসলমানও এ ধরনের কিছু মিথ্যা ধারণার ওপর নির্ভর করে বসে আছে। তারা মনে করে, আমরা অমুক বোজর্গের আওলাদ এবং অমুক বোজর্গের ভক্ত। কাজেই তাদের সুপারিশই আমাদের আল্লাহর শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু এখানে এর বিপরীতে যে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে তা

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

হে মুহাম্মাদ! এসব গায়েবের খবর, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। এর আগে তুমি এসব জানতে না এবং তোমার কওমও জানতো না। কাজেই সবর করো। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।[৫৩]

৫ রুকূ'

আর আদের কাছে আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম।[৫৪] *সে বললোঃ "হে আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা নিছক মিথ্যা বানিয়ে রেখেছো।*[৫৫]

হচ্ছে এই যে, একজন মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে ডুবে যেতে দেখছেন এবং অস্থির হয়ে সন্তানের গোনাহ মাফ করার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে জবাবে তাকে ধমক দেয়া হচ্ছে। বাপের পয়গম্বরীর মর্যাদাও ছেলেকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারছে না।

৫২. অর্থাৎ যে পাহাড়ের ওপর নৌকা থেমেছিল তার ওপর থেকে নেমে যাও।

৫৩. অর্থাৎ যেভাবে শেষ পর্যন্ত নূহ ও তাঁর সংগী সাথীরা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি তুমি ও তোমার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবে এবং তোমাদেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি, শুরুতে সত্যের দুশমনরা যতই সফলতার অধিকারী হোক না কেন সবশেষে একমাত্র তারাই সফলকাম হয় যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে চিন্তা ও কর্মের ভুল পথ পরিহার করে হকের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। কাজেই এখন যেসব বিপদ আপদ ও দুঃখ–কষ্টের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যেসব সমস্যা সংকটের সম্মুখীন তোমাদের হতে হচ্ছে এবং তোমাদের দাওয়াতকে দাবিয়ে দেবার জন্য তোমাদের বিরোধীদের আপাতদৃষ্টে যে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তোমাদের মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। বরং তোমরা সবর ও হিম্মত সহকারে কাজ করে যাও।

৫৪. সূরা আরাফের ৫ রুকূ'র টীকাগুলো একনজর দেখে নিন।

৫৫. অর্থাৎ অন্যান্য যেসব মাবুদদের তোমরা বন্দেগী ও পূজা–উপাসন করো তারা আসলে কোন ধরনের প্রভুত্বের গুণাবলী ও শক্তির অধিকারী নয়। বন্দেগী ও পূজা লাভের কোন অধিকারই তাদের নেই। তোমরা অযথাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। তারা তোমাদের আশা পূরণ করবে এ আশা নিয়ে বৃথাই বসে আছো।

يٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ اَجۡرًا ؕ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىۡ فَطَرَنِىۡ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۵۱﴾ وَيٰقَوۡمِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ يُرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيۡكُمۡ مِّدۡرَارًا وَّيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡا مُجۡرِمِيۡنَ ﴿۵۲﴾

হে আমার কওমের ভাইয়েরা! এ কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই জিম্মায় যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তোমরা কি একটুও বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করো না?[৫৬] আর হে আমার কওমের লোকেরা! মাফ চাও তোমাদের রবের কাছে তারপর তাঁর দিকেই ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের মুখ খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির ওপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন।[৫৭] অপরাধীদের মতো মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

৫৬. এটি একটি চমৎকার অলংকার সমৃদ্ধ বাক্য। এর মধ্যে একটি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আমার কথাকে তোমরা হালকাভাবে গ্রহণ করে উপেক্ষা করে যাচ্ছো এবং এ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করছো না। ফলে তোমরা যে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো না এটি তার একটি প্রমাণ। নয়তো যদি তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে তাহলে অবশ্যি একথা চিন্তা করতে যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই যে ব্যক্তি দাওয়াত, প্রচার, উপদেশ, নসীহতের ক্ষেত্রে এহেন কষ্ট, ক্লেশ ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে, যার এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তোমরা কোন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থের গন্ধই পেতে পারো না, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের এমন কোন বুনিয়াদ এবং মানসিক প্রশান্তির এমন কোন উপকরণের অধিকারী যার ভিত্তিতে সে নিজের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে এবং নিজের বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজেকে মারাত্মক ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। যার ফলে শত শত বছরের রচিত জমাট বাঁধা আকীদা-বিশ্বাস, রসম- রেওয়াজ ও জীবনধারার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে এবং তার কারণে সারা দুনিয়ার শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছে। এ ধরনের মানুষের কথা আর যাই হোক এতটা হালকা হতে পারে না যে, না জেনে বুঝেই তা প্রত্যাখ্যান করা যায়। একটু বিবেচনা সহকারে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য মন-মস্তিষ্ককে সামান্যতম কষ্ট না দেবার মতো গুরুত্বহীন তা কোনক্রমেই হতে পারে না।

৫৭. প্রথম রুকূ'তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে যে কথা উচ্চারণ করানো হয়েছিল এখানে সেই একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছিল, "তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন" এ থেকে জানা গেলো, কেবল আখেরাতেই নয়, এ দুনিয়াতেও জাতিদের ভাগ্যের ওঠানামা চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এ বিশ্ব-

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۭ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

তারা জবাব দিল : "হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসোনি।[৫৮] তোমার কথায় আমরা আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছি না। আমরা তো মনে করি তোমার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে।"[৫৯]

হূদ বললো : " আমি আল্লাহর সাক্ষ পেশ করছি।[৬০] আর তোমরা সাক্ষী থাকো তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় আল্লাহকে ছাড়া যে অন্যদেরকে শরীক করে রেখেছো তা থেকে আমি মুক্ত।[৬১]

জাহানের ওপর আল্লাহ তাঁর শাসন পরিচালনা করছেন নৈতিক মূলনীতির ভিত্তিতে, নৈতিক ভালো-মন্দের পার্থক্য শূন্য প্রাকৃতিক নীতির ভিত্তিতে নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, যখন নবীর মাধ্যমে একটি জাতির কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে যায় তখন তার ভাগ্য ঐ পয়গামের সাথে বাঁধা হয়ে যায়। যদি সে ঐ পয়গাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ ও বরকতের দরজা খুলে দেন। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করে বসে তাহলে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যে নৈতিক আইনের ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষের সাথে আচরণ করছেন এটি যেন তার একটি ধারা। অনুরূপভাবে সেই আইনের আর একটি ধারা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিতে প্রতারিত হয়ে যে জাতি জুলুম ও গোনাহের কাজে অগ্রসর হয় তার পরিণাম হয় ধ্বংস। কিন্তু ঠিক যখন সে তার অশুভ পরিণামের দিকে লাগামহীনভাবে ছুটে চলছে তখনই যদি সে তার ভুল অনুভব করে এবং নাফরমানির পথ পরিহার করে আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে তাহলে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। তার কাজের অবকাশ দানের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয় আগামীতে তার ভাগ্যে আযাবের পরিবর্তে পুরস্কার, উন্নতি ও সফলতা লিখে দেয়া হয়।

৫৮. অর্থাৎ এমন কোন দ্ব্যর্থহীন আলামত অথবা কোন সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে আসোনি যার ভিত্তিতে আমরা নিসংশয়ে জানতে পারি যে, আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছেন এবং যে কথা তুমি পেশ করছো তা সত্য।

৫৯. অর্থাৎ তুমি কোন দেবদেবী, বা কোন মহাপুরুষের আস্তানায় গিয়ে কিছু বেয়াদবী করেছো, যার ফল এখন তুমি ভোগ করছো। এর ফলে তুমি আবোল তাবোল কথা বলতে শুরুকরেছো এবং গতকালও যেসব জনবসতিতে তুমি সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বাস

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝٥٥ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۭ مَا مِنْ دَاۗبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ اِنَّ
رَبِّيْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٥٦ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ
بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَـيْـــًٔـا ۭ
اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝٥٧

তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার করো, তাতে কোন ত্রুটি রেখো না এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না।[৬২] আমার ভরসা আল্লাহর ওপর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। তিনিই প্রতিটি প্রাণীর ভাগ্যনিয়ন্তা। নিসন্দেহে আমার রব সরল পথে আছেন।[৬৩] যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও তাহলে ফিরিয়ে নাও, কিন্তু যে পয়গাম দিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে বসাবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।[৬৪] অবশ্যি আমার রব প্রতিটি জিনিসের সংরক্ষক।

করছিলে আজ সেখানে গালিগালাজ ও মারধরের মাধ্যমে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

৬০. অর্থাৎ তোমরা বলছো আমি কোন সাক্ষ–প্রমাণ নিয়ে আসিনি অথচ ছোট ছোট সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করার পরিবর্তে আমি তো সবচেয়ে বড় আল্লাহর সাক্ষ পেশ করছি। তিনি তাঁর সমগ্র সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সহকারে সৃষ্টি জগতের সকল অংশে এবং তার দীপ্তির প্রতিটি কণিকায় একথার সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছেন যে, তোমাদের কাছে আমি যে সত্য বর্ণনা করেছি তা পুরোপুরি ও সম্পূর্ণ সত্য। তার মধ্যে মিথ্যার নাম গন্ধও নেই। অন্যদিকে তোমরা যেসব ধারণা–কল্পনা ও অনুমান দাঁড় করিয়েছো সেগুলো মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেগুলোর মধ্যে সত্যের গন্ধও নেই।

৬১. তারা যে কথা বলে আসছিল যে, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই—এর জবাবেই একথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আমার এ সিদ্ধান্তও শুনে রাখো, আমি তোমাদের এসব উপাস্যের প্রতি চরমভাবে বিরূপ ও অসন্তুষ্ট।

৬২. 'তোমার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে—তাদের এ বক্তব্যের জবাবেই একথা বলা হয়েছে। (তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা ইউনূস ৭১ আয়াত)।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ
وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ
الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا
بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا
اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেলো তখন নিজের রহমতের সাহায্যে হূদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম এবং একটি কঠিন আযাব থেকে বাঁচালাম।

এ হচ্ছে আদ, নিজের রবের নিদর্শন তারা অস্বীকার করেছে, নিজের রসূলদের কথাও অমান্য করেছে।[৬৫] এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী সত্যের দুশমনের আদেশ মেনে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়ায় তাদের ওপর লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও। শোনো! আদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছিল। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে হূদের জাতি আদকে।

৬ রুকূ'

আর সামুদের কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম।[৬৬] সে বললো, "হে আমার কওমের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদের যমীন থেকে পয়দা করেছেন এবং এখানেই তোমাদের বসবাস করিয়েছেন।[৬৭] কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও[৬৮] এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে আছেন তিনি ডাকের জবাব দেন।"[৬৯]

৬৩. অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন ঠিকই করেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই সহজ সরল। তিনি অন্ধকার ও অন্যায়ের রাজত্বে বাস করেন না। তিনি পূর্ণসত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন। তুমি পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হবে এবং তারপরও আখেরাতে সফলকাম হবে আর আমি সত্য–সরল পথে চলবো ও সৎকর্মশীল হবো এবং তারপরও ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল হবো, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না।

৬৪. 'আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছি না' তাদের একথার জবাবে এ উক্তি করা হয়েছে।

৬৫. তাদের কাছে মাত্র একজন রসূলই এসেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাদেরকে এমন এক বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন যে দাওয়াত সবসময় সবযুগে ও সকল জাতির মধ্যে আল্লাহর নবীগণ পেশ করতে থেকেছেন, তাই এক রসূলের কথা না মানাকে সকল রসূলের প্রতি নাফরমানী গণ্য করা হয়েছে।

৬৬. এ ক্ষেত্রে সূরা আ'রাফের দশম রুকূ'র টীকাগুলো সামনে রাখুন।

৬৭. প্রথম বাক্যাংশে যে দাবী করা হয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এটি হচ্ছে সেই দাবীর সপক্ষে যুক্তি। মুশরিকরা নিজেরাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহই তাদের স্রষ্টা। এ স্বীকৃত সত্যের ওপর যুক্তির ভিত্তি করে হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বুঝান ঃ পৃথিবীর নিষ্প্রাণ উপাদানের সংমিশ্রণে যখন আল্লাহই তোমাদের এ পার্থিব অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই যখন এ পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করেছেন তখন সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকার সেই আল্লাহ ছাড়া আর কার থাকতে পারে? তিনি ছাড়া আর কে বন্দেগী পূজা–উপাসনা লাভের অধিকার পেতে পারে?

৬৮. অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত তোমরা অন্যের বন্দেগী ও পূজা–অর্চনা করে এসেছো। সে অপরাধের জন্য তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও।

৬৯. এখানে মুশরিকদের একটি মস্তবড় বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রায় তাদের প্রত্যেকেই এর শিকার। যেসব মারাত্মক বিভ্রান্তি প্রতি যুগে মানুষকে শিরকে লিপ্ত করেছে, এটি তাদের অন্যতম। তারা আল্লাহকে দুনিয়ার অন্যান্য রাজা, মহারাজা ও বাদশাহদের সমান মনে করে। অথচ এ রাজা–বাদশাহরা প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে নিজেদের প্রাসাদসমূহে বিলাসী জীবন যাপন করে। তাদের দরবারে সাধারণ প্রজারা পৌঁছুতে পারে না এবং সেখানে কোন আবেদন পৌঁছাতে হলে ঐ রাজাদের প্রিয়পাত্রদের কারো শরণাপন্ন হতে হয়। এরপর আবার সৌভাগ্যক্রমে কারো আবেদন যদি তাদের সুউচ্চ বালাখানায় পৌঁছে যায়ও তাহলেও প্রভুত্বের অহমিকায় মত্ত হয়ে তারা নিজেরা এর জবাব দিতে পছন্দ করে না। বরং প্রিয়পাত্রদের মধ্য থেকে কারো ওপর এর জবাব দেবার দায়িত্ব অর্পণ করে। এ ভুল ধারণার কারণে তারা মনে করে এবং ধুরন্ধর লোকেরা তাদের একথা বুঝাবার চেষ্টাও করেছে যে, বিশ্ব–জাহানের অধিপতি মহাশক্তিধর আল্লাহর মহিমান্বিত দরবার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বহুদূরে অবস্থিত। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর দরবারে পৌঁছে যাওয়া কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে। মানুষের দোয়া ও প্রার্থনা সেখানে পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে তার জওয়াব আসা তো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে হাঁ যদি পবিত্র আত্মাসমূহের 'অসিলা' ধরা হয় এবং যেসব ধর্মীয় পদাধিকারীরা ওপর তলায় নযর–নিয়ায ও আবেদন নিবেদন পেশ করার কায়দা জানেন তাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে। এ বিভ্রান্তিটিই বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে বহু ছোটবড় মাবুদ এবং বিপুল সংখ্যক সুপারিশকারী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর এই সাথে পুরোহিতগিরির (Priesthood) এক সুদীর্ঘ ধারা চালু হয়ে গেছে, যার মাধ্যমে ছাড়া

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝٦٢

তারা বললো, "হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলে যার কাছে ছিল আমাদের বিপুল প্রত্যাশা।[৭০] আমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করতো তুমি কি তাদের পূজা করা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাচ্ছো?[৭১] তুমি যে পথের দিকে আমাদের ডাকছো সে ব্যাপারে আমাদের ভীষণ সন্দেহ, যা আমাদের পেরেশানির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"[৭২]

জাহেলী ধর্মসমূহের অনুসারীরা তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে সক্ষম নয়।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম জাহেলিয়াতের এ গোটা ধুম্রজালকে শুধুমাত্র দু'টি শব্দের সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। শব্দ দুটির একটি হচ্ছে 'কারীব'—আল্লাহ নিকটবর্তী এবং দ্বিতীয়টি 'মুজীব' —আল্লাহ জবাব দেন। অর্থাৎ তিনি দূরে আছেন, তোমাদের এ ধারণা যেমন ভুল তেমনি তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের আবেদন নিবেদনের জবাব হাসিল করতে পারো না, এ ধারণাও একই রকম ভুল। তিনি যদিও অনেক উচ্চস্থানের অধিকারী ও অনেক উচ্চ মর্যাদাশালী তবুও তিনি তোমাদের নিকটেই থাকেন। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁকে নিজের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে পেতে পারে এবং তাঁর সাথে সংগোপনে কথা বলতে পারে। প্রকাশ্য জনসমক্ষে এবং একান্ত গোপনে একাকী অবস্থায়ও নিজের আবেদন নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করতে পারে। তারপর তিনি সরাসরি প্রত্যেক বান্দার আবেদনের জবাব নিজেই দেন। কাজেই বিশ্ব–জাহানের বাদশাহর সাধারণ দরবার যখন সবসময় সবার জন্য খোলা আছে এবং তিনি সবার কাছাকাছি রয়েছেন তখন তোমরা বোকার মতো এ জন্য মাধ্যম ও অসীলা খুঁজে বেড়াচ্ছো কেন? (এছাড়া দেখুন সূরা বাকারার ১৮৮ টীকা)

৭০. অর্থাৎ তোমার বুদ্ধিমত্তা, বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা ও মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব দেখে আমরা আশা করেছিলাম তুমি ভবিষ্যতে একজন বিরাট নামীদামী ব্যক্তি হবে। একদিকে যেমন তুমি বিপুল বৈষয়িক ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে তেমনি অন্যদিকে আমরাও অন্য জাতি ও গোত্রের মোকাবিলায় তোমার প্রতিভা ও যোগ্যতা থেকে লাভবান হবার সুযোগ পাবো। কিন্তু তুমি এ তাওহীদ ও আখেরাতের নতুন ধূয়া তুলে আমাদের সমস্ত আশা–আকাংখা বরবাদ করে দিয়েছো। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও এ ধরনের কিছু চিন্তা তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেতো। তারাও নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর উন্নত যোগ্যতা ও গুণাবলীর স্বীকৃতি দিতো। তারা মনে করতো এ ব্যক্তি ভবিষ্যতে একজন বিরাট ব্যবসায়ী হবে এবং তার বিচক্ষণতা ও বিপুল বুদ্ধিমত্তা আমাদেরও অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে যখন তিনি তাওহীদ ও আখেরাত এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর দাওয়াত দিতে

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

সালেহ বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা কি কখনো একথাটিও চিন্তা করেছো যে, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি অকাট্য প্রমাণ পেয়ে থাকি এবং তারপর তিনি তাঁর অনুগ্রহও আমাকে দান করে থাকেন, আর এরপরও যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? আমাকে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে লাগতে পারো?[৭৩] *আর হে আমার কওমের লোকেরা! দেখো, এ আল্লাহর উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। একে পীড়া দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতে বেশী দেরী হবে না"।*

থাকলেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে কেবল নিরাশই হলো না বরং তাঁর প্রতি হয়ে উঠলো অসন্তুষ্ট। তারা বলতে লাগলো, বেশ ভালো কাজের লোকটি ছিল কিন্তু কি জানি তাকে কি পাগলামিতে পেয়ে বসলো, নিজের জীবনটাও বরবাদ করলো এবং আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাও ধূলায় মিশিয়ে দিল।

৭১. এ মাবুদগুলো ইবাদাত লাভের হকদার কেন এবং কেন এদের পূজা করা উচিত—এর যুক্তি হিসেবে একথা বলা হয়েছে। এখানে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতির পার্থক্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হযরত সালেহ (আ) বলেছিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই এবং এর যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে বসবাস করিয়েছেন। এর জবাবে এ মুশরিকরা বলছে, আমাদের এ মাবুদরাও ইবাদাত লাভের হকদার এবং এদের ইবাদাতও পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কারণ বাপ–দাদাদের আমল থেকে এদের ইবাদাত হতে চলে আসছে। অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা উচিত। কারণ শুরুতে একটি নির্বোধ এ পথে চলেছিল। তাই এখন এ পথে চলার জন্য আর এর চেয়ে বেশী কোন যুক্তির প্রয়োজন নেই যে, দীর্ঘকাল ধরে বহু বেকুফ এ পথেই চলছে।

৭২. এ সন্দেহ ও সংশয় কোন্ বিষয়ে ছিল? এখানে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এর কারণ, সবাই সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকের সন্দেহের ধরন ছিল আলাদা। সত্যের দাওয়াতের বৈশিষ্ট হচ্ছে, এ দাওয়াত দেবার পর লোকদের মানসিক প্রশান্তি

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝ فَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِىِٕذٍ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۝

কিন্তু তারা উটনীটিকে মেরে ফেললো। এর ফলে সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলো এই বলে, "ব্যস, আর তিন দিন তোমাদের গৃহে অবস্থান করে নাও। এটি এমন একটি মেয়াদ, যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না।"

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও তার ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে বাঁচালাম।[৭৪] *নিসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী। আর যারা জুলুম করেছিল একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তারা নিজেদের বাড়ীঘরে এমন অসাড় ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে রইলো যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি।*

শোনো! সামূদ তার রবের সাথে কুফরী করলো। শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হলো সামূদকে।

খতম হয়ে যায় এবং একটি ব্যাপক অস্থিরতা জন্ম নেয়। যদিও প্রত্যেকের অনুভূতি অন্যের থেকে ভিন্নতর হয় কিন্তু এ অস্থিরতার অংশ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পেয়ে যায়। ইতিপূর্বে লোকেরা যেমন নিশ্চিন্ত মনে গোমরাহীতে লিপ্ত থাকতো এবং নিজেরা কি করে যাচ্ছে একথা একবার চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করতো না, ঠিক এ ধরনের নিশ্চিন্ততা এ সত্যের দাওয়াত দানের পর আর অব্যাহত থাকতো না এবং থাকতে পারে না। জাহেলী ব্যবস্থার দুর্বলতার ওপর সত্যের আহবায়কের নির্দয় সমালোচনা, সত্যকে প্রমাণ করার জন্য তার শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি, তারপর তার উন্নত চরিত্র, দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য–স্থৈর্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্য তার অত্যন্ত স্পষ্ট সরল ও সত্যনিষ্ঠ ভূমিকা এবং তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, যার প্রভাব তার চরম হঠকারী ও কট্টর বিরুদ্ধবাদীরও মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসে, সর্বোপরি সমকালীন সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের তাঁর কথায় প্রভাবিত হতে থাকা এবং তাদের জীবনে সত্যের দাওয়াতের প্রভাবে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হওয়া—এসব জিনিস মিলেমিশে একটা জটিল

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَاٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

৭ রুকূ'

আর দেখো ইবরাহীমের কাছে আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে পৌঁছলো। তারা বললো, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জওয়াবে বললো, তোমাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। তারপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ইবরাহীম একটি কাবাব করা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য)[৭৫] নিয়ে এলো। কিন্তু যখন দেখলো তাদের হাত আহারের দিকে এগুচ্ছে না তখন তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়লো এবং তাদের ব্যাপারে মনে মনে ভীতি অনুভব করতে লাগলো।[৭৬] তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমাদের তো লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।"[৭৭] ইবরাহীমের স্ত্রীও দাঁড়িয়ে ছিল, সে একথা শুনে হেসে ফেললো।[৭৮] তারপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুখবর দিলাম।[৭৯]

পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর ফলে যারা সত্যের আগমনের পরও পুরাতন জাহেলিয়াতের ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখতে চায় তাদের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

৭৩. অর্থাৎ যদি আমি নিজের অন্তরদৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিছক তোমাদের খুশী করার জন্য গোমরাহীর পথ অবলম্বন করি তাহলে শুধু আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই নয় বরং তোমাদের কারণে আমার অপরাধ আরো বেশী বেড়ে যাবে। উপরন্তু আমি তোমাদের সোজা পথ বাতলে দেবার পরিবর্তে উলটো আরো জেনেবুঝে তোমাদের গোমরাহ করেছি এ অপরাধে আল্লাহ আমাকে আরো অতিরিক্ত শাস্তি দেবেন।

৭৪. সিনাই উপদ্বীপে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, যখন সামূদ জাতির ওপর আযাব আসে তখন হযরত সালেহ (আ) হিজরাত করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এ জন্যই "হযরত মূসার পাহাড়ের" কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের নাম "নবী সালেহের পাহাড়" এবং কথিত আছে যে, এখানেই তিনি অবস্থান করেছিলেন।

৭৫. এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমের কাছে এসেছিলেন মানুষের আকৃতি ধরে। শুরুতে তারা নিজেদের পরিচয় দেননি। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে অপরিচিত বিদেশী মেহমান মনে করে আসার সাথে সাথেই তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৭৬. কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এ ভয়ের কারণ ছিল এই যে, অপরিচিত নবাগতরা খেতে ইতস্তত করলে তাদের নিয়তের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীমের মনে সন্দেহ জাগে এবং তারা কোন প্রকার শত্রুতার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কিনা—এ চিন্তা তাঁর মনকে আতংকিত করে তোলে। কারণ আরব দেশে কোন ব্যক্তি কারোর মেহমানদারীর জন্য আনা খাবার গ্রহণ না করলে মনে করা হতো সে মেহমান হিসেবে নয় বরং হত্যা ও লুটতরাজের উদ্দেশ্যে এসেছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলো এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না।'

৭৭. কথা বলার এ ধরন থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, খাবারের দিকে তাদের হাত এগিয়ে যেতে না দেখে হযরত ইবরাহীম (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা। আর যেহেতু ফেরেশতাদের প্রকাশ্যে মানুষের বেশে আসা অস্বাভাবিক অবস্থাতেই হয়ে থাকে, তাই হযরত ইবরাহীম মূলত যে বিষয়ে ভীত হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা বা তাঁর জনপদের লোকেরা অথবা তিনি নিজেই এমন কোন দোষ করে বসেননি তো যে ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য ফেরেশতাদের এই আকৃতিতে পাঠানো হয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির যে কথা বুঝেছেন প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হতো তাহলে ফেরেশতারা এভাবে বলতো ঃ "ভয় পেয়ো না, আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা।" কিন্তু যখন তারা তাঁর ভয় দূর করার জন্য বললো ঃ "আমাদের তো লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে," তখন জানা গেলো যে, তাদের ফেরেশতা হওয়ার ব্যাপারটা হযরত ইবরাহীম জেনে গিয়েছিলেন, তবে এ ভেবে তিনি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ফেরেশতারা যখন এ ফিতনা ও পরীক্ষার আবরণে হাযির হয়েছেন তখন কে সেই দুর্ভাগা যার সর্বনাশ সূচিত হতে যাচ্ছে?

৭৮. এ থেকে বুঝা যায়, ফেরেশতার মানুষের আকৃতিতে আসার খবর শুনেই পরিবারের সবাই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। এ খবর শুনে হযরত ইবরাহীমের স্ত্রীও ভীত হয়ে বাইরে বের হয়ে এসেছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনলেন, তাদের গৃহের বা পরিবারের ওপর কোন বিপদ আসছে না। তখনই তার ধড়ে প্রাণ এলো এবং তিনি আনন্দিত হলেন।

৭৯. ফেরেশতাদের হযরত ইবরাহীমের পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী হযরত সারাহকে এ খবর শুনাবার কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভে সাইয়্যিদিনা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত হযরত সারাহ ছিলেন সন্তানহীনা। তাই তাঁর মনটিই ছিল বেশী বিষন্ন। তাঁর মনের এ বিষন্নতা দূর করার জন্য তাঁকে শুধু ইসহাকের মতো মহান গৌরবান্বিত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ সুসংবাদও দেন যে, এ পুত্রের পরে আসছে ইয়াকূবের মতো নাতি, যিনি হবেন বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۖ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۖ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

সে বললো ঃ হায়, আমার পোড়া কপাল![৮০] এখন আমার সন্তান হবে নাকি, যখন আমি হয়ে গেছি খুনখুনে বুড়ী আর আমার স্বামীও হয়ে গেছে বুড়ো?[৮১] এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার।" ফেরেশতারা বললো ঃ "আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে অবাক হচ্ছো?[৮২] হে ইবরাহীমের গৃহবাসীরা! তোমাদের প্রতি তো রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত, আর অবশ্যি আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসাই এবং বড়ই শান শওকতের অধিকারী।"

তারপর যখন ইবরাহীমের আশংকা দূর হলো এবং (সন্তানের সুসংবাদে) তার মন খুশীতে ভরে গেলো তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ শুরু করলো।[৮৩] আসলে ইবরাহীম ছিল বড়ই সহনশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সে সকল অবস্থায়ই আমার দিকে রুজূ করতো। (অবশেষে আমার ফেরেশ্তারা তাকে বললা ঃ) "হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত হও। তোমার রবের হুকুম হয়ে গেছে, কাজেই এখন তাদের ওপর এ আযাব অবধারিত। কেউ ফেরাতে চাইলেই তা ফিরতে পারে না।"[৮৪]

৮০. এর মানে এ নয় যে, হযরত সারাহ এ খবর শুনে যথার্থই খুশী হবার পরিবর্তে উল্টো একে দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। বরং আসলে এগুলো এমন ধরনের শব্দ ও বাক্য, যা মেয়েরা সাধারণত কোন ব্যাপারে অবাক হয়ে গেলে বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে এর শাব্দিক অর্থ এখানে লক্ষ হয় না বরং নিছক বিস্ময় প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

৮১. বাইবেল থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীমের বয়স এ সময় ছিল ১০০ বছর এবং হযরত সারাহর বয়স ছিল ৯০ বছর।

৮২. এর মানে হচ্ছে, যদিও প্রকৃতিগত নিয়ম অনুযায়ী এ বয়সে মানুষের সন্তান হয় না তবুও আল্লাহর কুদরতে এমনটি হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপারও নয়। আর এ সুসংবাদ

যখন তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে তখন তোমার মতো একজন মুমিনা মহিলার পক্ষে এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই।

৮৩. এহেন পরিস্থিতিতে "বাদানুবাদ" শব্দটি আল্লাহর সাথে হযরত ইবরাহীমের গভীর ভালোবাসা ও মান-অভিমানের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। এ শব্দটি বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বিতর্ক জারি থাকার একটি দৃশ্যপট অংকন করে। লূতের সম্প্রদায়ের ওপর থেকে কোন প্রকারে আযাব সরিয়ে দেবার জন্য বান্দা বারবার জোর দিচ্ছে। আর জবাবে আল্লাহ বলছেন, এ সম্প্রদায়টির মধ্যে এখন ন্যায়, কল্যাণ ও সততার কোন অংশই নেই। এর অপরাধসমূহ এমনভাবে সীমা অতিক্রম করেছে যে, একে আর কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। বান্দা তবুও আবার বলে যাচ্ছে ঃ "হে পরওয়ারদিগার! যদি সামান্যতম সদ্‌গুণও এর মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে একে আরো একটু অবকাশ দিন, হয়তো এ সদগুণ কোন সুফল বয়ে আনবে।" বাইবেলে এ বাদানুবাদের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তার তুলনায় আরো বেশী অর্থবহ ব্যাপকতার অধিকারী। তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য বাইবেল আদি পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২৩-৩২ বাক্য দেখুন)

৮৪. বর্ণনার এ ধারাবাহিকতায় হযরত ইবরাহীমের এ ঘটনাটি বিশেষ করে লূতের সম্প্রদায়ের ঘটনার মুখবন্ধ হিসেবে বাহ্যত কিছুটা বেখাপ্পা মনে হয়। কিন্তু আসলে যে উদ্দেশ্যে অতীত ইতিহাসের এ ঘটনাবলী এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে এটা এখানে যথার্থই প্রযোজ্য হয়েছে। ঘটনাগুলোর এ পারস্পরিক যোগসূত্র অনুধাবন করার জন্য নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় সামনে রাখতে হবে।

এক ঃ এখানে কুরাইশ গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের আওলাদ হওয়ার কারণে তারা আরব এলাকার সমগ্র জনবসতির কাছে পীরজাদা, আল্লাহর ঘর কা'বার খাদেম এবং ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের অধিকারী সেজে বসেছে। তারা প্রচন্ড অহংকারে মত্ত। তারা মনে করে, তাদের ওপর আল্লাহর গজব কেমন করে আসতে পারে! তারা তো আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দার আওলাদ। আল্লাহর দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য তিনি রয়েছেন। তাদের এ মিথ্যা অহংকার চূর্ণ করার জন্য প্রথমে তাদের এ দৃশ্য দেখানো হলো যে, হযরত নূহের মতো মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা ছেলেকে ডুবতে দেখছেন। তাকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু শুধু যে, তাঁর সুপারিশ তাঁর ছেলের কোন কাজে আসেনি তা নয় বরং উলটো এ সুপারিশ করার কারণে তাঁকে ধমক খেতে হচ্ছে। তারপর এখন এ দ্বিতীয় দৃশ্য দেখানো হচ্ছে খোদ হযরত ইবরাহীমের। একদিকে তাঁর ওপর অজস্র অনুগ্রহ বর্ষণ করা হয়েছে এবং অত্যন্ত স্নেহার্দ্র ও কোমল ভংগীতে তাঁর কথা আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে যখন সেই ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আবার ইনসাফের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন তখন তাঁর তাকীদ ও চাপ প্রদান সত্ত্বেও আল্লাহ অপরাধী জাতির মোকাবিলায় তাঁর সুপারিশ রদ করে দিচ্ছেন।

দুই ঃ এ ভাষণের উদ্দেশ্য কুরাইশদের মনের মধ্যে একথাও গেঁথে দেয়া যে, আল্লাহর যে কর্মফল বিধির ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হয়ে তারা বসে ছিল,

وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوۡمٌ عَصِيۡبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ اِلَيۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىۡ هُنَّ اَطۡهَرُ لَكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِىۡ ضَيۡفِىۡ ؕ اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوۡا لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِىۡ بَنٰتِكَ مِنۡ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيۡدُ ﴿٧٩﴾

আর যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌছে গেলো[৮৫] তখন তাদের আগমনে সে খুব ঘাবড়ে গেলো এবং তার মন ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, আজ বড় বিপদের দিন।[৮৬] (এ মেহমানদের আসার সাথে সাথেই) তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দ্বিধায় তার ঘরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আগে থেকেই তারা এমনি ধরনের কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললো ঃ "ভাইয়েরা! এই যে, এখানে আমার মেয়েরা আছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর।[৮৭] আল্লাহর ভয়-ডর কিছু করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই?" তারা জবাব দিল ঃ "তুমি তো জানোই, তোমার মেয়েদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই[৮৮] এবং আমরা কি চাই তাও তুমি জানো।"

তা কিভাবে ইতিহাসের আবর্তনে ধারাবাহিকভাবেও যথারীতি প্রকাশ পেয়ে এসেছে এবং কেমন সব প্রকাশ্য লক্ষণ তাদের নিজেদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। একদিকে রয়েছেন হযরত ইবরাহীম। তিনি সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে গৃহহারা হয়ে একটি অপরিচিত দেশে অবস্থান করছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কোন শক্তি–সামর্থ নেই। কিন্তু তাঁর সৎকর্মের ফল আল্লাহ তাঁকে এমনভাবে দান করেন যে, তাঁর বুড়ী ও বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। তারপর হযরত ইসহাকের ঔরসে ইয়াকূব আলাইহিস সালামেরও জন্ম হয়। তাঁর থেকে বনী ইসরাঈলের সুবিশাল বংশধারা এগিয়ে চলে। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা শত শত বছর ধরে বাজতে থাকে ফিলিস্তিন ও সিরীয় ভূখণ্ডে, যেখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একদিন গৃহহারা মুহাজির হিসেবে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অন্যদিকে রয়েছে লূতের সম্প্রদায়। এ ভূখণ্ডের একটি অংশে তারা প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং নিজেদের ব্যভিচারমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত

থাকছে। বহুদূর পর্যন্ত কোথাও তারা নিজেদের বদকর্মের জন্য কোন আযাবের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না। লূত আলাইহিস সালামের উপদেশকে তারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যে তারিখে ইবরাহীমের বংশ থেকে একটি বিরাট সৌভাগ্যবান জাতির উত্থানের ফায়সালা করা হয় ঠিক সেই একই তারিখেই এ ব্যভিচারী জাতিটিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ফরমানও জারি হয়ে যায়। এমন বিভীষিকাময় পদ্ধতিতে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয় যে, আজ তাদের জনবসতির নাম–নিশানাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮৫. সূরা আ'রাফের ১০ রুকূ'র টীকাগুলো দেখুন।

৮৬. এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে তার বক্তব্যের অন্তরনিহিত তাৎপর্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফেরেশতারা সুন্দর ছেলেদের ছদ্মবেশে হযরত লূতের গৃহে এসেছিলেন। তারা যে ফেরেশতা একথা হযরত লূত জানতেন না। এ কারণে এ মেহমানদের আগমনে তিনি খুব বেশী মানসিক উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন এবং তাঁর মনও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের সম্প্রদায়কে জানতেন। তারা কেমন ব্যভিচারী এবং কী পর্যায়ের নির্লজ্জ হয়ে গেছে তা তাঁর জানা ছিল।

৮৭. হতে পারে হযরত লূত সমগ্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের দিকে ইংগিত করেছেন। কারণ নবী তার সম্প্রদায়ের জন্য বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। আর সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাঁর দৃষ্টিতে নিজের মেয়ের মতো হয়ে থাকে। আবার এও হতে পারে যে, তাঁর ইংগিত ছিল তাঁর নিজের মেয়েদের প্রতি। তবে ব্যাপার যাই হোক না কেন উভয় অবস্থাতেই একথা ধারণা করার কোন কারণই নেই যে, হযরত লূত তাদেরকে যিনা করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। "এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর"— একথাই যাবতীয় ভুল অর্থের অবকাশ খতম করে দিয়েছে। হযরত লূতের বক্তব্যের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ যে জায়েয পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতেই নিজেদের যৌন কামনা পূর্ণ করো এবং এ জন্য মেয়েদের অভাব নেই।

৮৮. এ বাক্যটি তাদের মানসিক অবস্থার পূর্ণচিত্র এঁকে দেয়। বুঝা যায় লাম্পট্যের ক্ষেত্রে তারা কত নিচে নেমে গিয়েছিল। তারা স্বভাব–প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ পরিহার করে একটি পূতিগন্ধময় প্রকৃতি বিরোধী পথে চলতে শুরু করেছিল, ব্যাপার শুধুমাত্র এতটুকুই ছিল না বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল যে, এখন শুধুমাত্র এ একটি নোংরা পথের প্রতিই ছিল তাদের সমস্ত ঝোঁক–প্রবণতা, আকর্ষণ ও অনুরাগ। তাদের প্রবৃত্তি এখন শুধুমাত্র এ নোংরামিরই অনুসন্ধান করে ফিরছিল। প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ তো আমাদের জন্য তৈরীই হয়নি—একথা বলতে তারা কোন লজ্জা অনুভব করতো না। এটা হচ্ছে নৈতিক অধপতন ও চারিত্রিক বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়। এর চেয়ে বেশী নিম্নগামিতার কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি নিছক নফ্স ও প্রবৃত্তির দুর্বলতার কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, এ সত্ত্বেও হালালকে কাংখিত এবং হারামকে পরিত্যাজ্য মনে করে, তার বিষয়টি খুবই হাল্কা। এমন ব্যক্তি কখনো সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। আর সংশোধিত হয়ে না গেলেও তার সম্পর্কে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সে একজন বিকৃত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির সমস্ত আগ্রহ হারামের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় এবং সে মনে করতে থাকে

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝٨٠ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝٨١ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ۬ مَّنْضُوْدٍ ۝٨٢ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝٨٣

লূত বললো ঃ "হায়! যদি আমার এতটা শক্তি থাকতো যা দিয়ে আমি তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম অথবা কোন শক্তিশালী আশ্রয় থাকতো সেখানে আশ্রয় নিতে পারতাম।" তখন ফেরেশতারা তাকে বললো ঃ "হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি কিছুটা রাত থাকতে তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও। আর সাবধান! তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়।[৮৯] কিন্তু তোমার স্ত্রী ছাড়া (সে সাথে যাবে না) কারণ তার ওপরও তাই ঘটবে যা ঐ সব লোকের ঘটবে।[৯০] তাদের ধ্বংসের জন্য প্রভাতকাল নির্দিষ্ট রয়েছে।–প্রভাত হবার আর কতটুকই বা দেরী আছে!"

তারপর যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো, আমি গোটা জনপদটি উল্‌টে দিলাম এবং তার ওপর পাকা মাটির পাথর অবিরামভাবে বর্ষণ করলাম,[৯১] যার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পাথর তোমার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল।[৯২] আর জালেমদের থেকে এ শাস্তি মোটেই দূরে নয়।[৯৩]

হালাল তার জন্য তৈরীই হয়নি তখন তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে না। সে আসলে একটি নোংরা কীট। মলমূত্র ও দুর্গন্ধের মধ্যেই সে প্রতিপালিত হয় এবং পাক–পবিত্রতার সাথে তার প্রকৃতিগত কোন সম্পর্কই নেই। এ ধরনের কীট যদি কোন পরিচ্ছন্নতা প্রিয় মানুষের ঘরে জন্ম নেয় তাহলে প্রথম সুযোগেই সে ফিনাইল ঢেলে দিয়ে তার অস্তিত্ব থেকে নিজের গৃহকে মুক্ত করে নেয়। তাহলে আল্লাহ তার যমীনে এ ধরনের নোংরা কীটদের সমাবেশকে কতদিন বরদাশ্‌ত করতে পারতেন।

৮৯. এর মানে হচ্ছে, এখন তোমাদের কিভাবে তাড়াতাড়ি এ এলাকা থেকে বের হয়ে যেতে পারো সে চিন্তা করা উচিত। পেছনে শোরগোল ও বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে তোমরা

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

৮ রুকূ'

আর মাদ্‌য়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শো'আয়েবকে পাঠালাম।[৯৪] সে বললো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আর মাপে ও ওজনে কম করো না। আজ আমি তোমাদের ভালো অবস্থায় দেখছি কিন্তু আমার ভয় হয় কাল তোমাদের ওপর এমন দিন আসবে যার আযাব সবাইকে ঘেরাও করে ফেলবে। আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! যথাযথ ইনসাফ সহকারে মাপো ও ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী কম দিয়ো না। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না। আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। মোট কথা আমি তোমাদের ওপর কোন কর্ম তত্ত্বাবধানকারী নই।[৯৫]

যেন পথে থেমে না যাও এবং আযাবের জন্য যে এলাকা নির্ধারিত হয়েছে আযাবের সময় এসে যাবার পরও তোমাদের কেউ যেন সেখানে অবস্থান না করে।

৯০. এটি তৃতীয় মর্মন্তুদ শিক্ষণীয় ঘটনা। এ সূরায় লোকদেরকে একথা শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন বুযর্গের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন বুযর্গের সুপারিশ তোমাদের নিজেদের গোনাহের পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে না।

৯১. সম্ভবত একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের আকারে এ আযাব এসেছিল। ভূমিকম্প জনবসতিটিকে ওলট–পালট করে দিয়েছিল এবং অগ্নুৎপাতের ফলে তার ওপর হয়েছিল ব্যাপক হারে পাথর বৃষ্টি। "পাকা মাটির পাথর" বলতে সম্ভবত এমন মাটি বুঝানো হয়েছে যা আগ্নেয়গিরির আওতাধীন এলাকার ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ও লাভার প্রভাবে পাথরে পরিণত হয়। আজ পর্যন্ত লূত সাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ ও পূর্ব এলাকায় এ পাথর বর্ষণের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰۤؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۞

তারা জবাব দিল ঃ "হে শো'আয়েব! তোমার নামায কি তোমাকে একথা শেখায়[৯৬] যে, আমরা এমন সমস্ত মাবুদকে পরিত্যাগ করবো যাদেরকে আমাদের বাপ–দাদারা পূজা করতো? অথবা নিজেদের ধন–সম্পদ থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার ইখতিয়ার আমাদের থাকবে না?[৯৭] ব্যস, শুধু তুমিই রয়ে গেছো একমাত্র উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী ও সদাচারী!"

৯২. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি পাথরকে কি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে হবে এবং কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর ওপর পড়বে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল।

৯৩. অর্থাৎ আজ যারা জুলুমের পথে চলছে তারাও যেন এ আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে না মনে করে। লূতের সম্প্রদায়ের ওপর যদি আযাব আসতে পেরে থাকে তাহলে তাদের ওপরও আসতে পারে। লূতের সম্প্রদায় আল্লাহর আযাব ঠেকাতে পারেনি, এরাও পারবে না।

৯৪. সূরা আ'রাফের ১১ রুকূ' দেখুন।

৯৫. অর্থাৎ তোমাদের ওপর আমার কোন জোর নেই। আমি তো শুধু একজন কল্যাণকামী উপদেষ্টা মাত্র। বড় জোর আমি তোমাদের বুঝাতে পারি। তারপর তোমরা চাইলে মানতে পারো আবার নাও মানতে পারো। আমার কাছে জবাবদিহি করার ভয় করা বা না করার প্রশ্ন নয়। বরং আসল প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করা। আল্লাহর কিছু ভয় যদি তোমাদের মনে থেকে থাকে তাহলে তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে বিরত থাকো।

৯৬. এটি আসলে একটি তিরস্কারসূচক বাক্য। যে সমাজ আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং ফাসেকী, অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে ডুবে গেছে এমন প্রত্যেকটি সমাজেই এ ভাবধারা আজো মূর্ত দেখা যাবে। যেহেতু নামায দীনদারীর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে সুস্পষ্ট চিহ্ন এবং ফাসেক ও ব্যভিচারী লোকেরা নামাযকে একটি ভয়ংকর বরং সবচেয়ে মারাত্মক রোগ মনে করে থাকে তাই এ ধরনের লোকদের সমাজে নামায ইবাদাতের পরিবর্তে রোগের চিহ্ন হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলে সংগে সংগেই তাদের মনে এ অনুভূতি জাগে যে, এ ব্যক্তির ওপর "দীনদারীর আক্রমণ" ঘটেছে। তারপর এরা দীনদারীর এ বৈশিষ্টও ভালোভাবে জানে যে, এ জিনিসটি যার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় সে কেবল নিজের সৎ ও পরিচ্ছন্ন কর্মধারার ওপরই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অন্যদেরকেও সংশোধন করার চেষ্টা করে এবং বে–দীনী ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনা না করে সে স্থির থাকতে পারে না। তাই নামাযের বিরুদ্ধে এদের অস্থিরতা শুধুমাত্র এ আকারে দেখা দেয় না যে, এদের এক ভাই দীনদারীর মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে বরং এ সংগে এদের মনে সন্দেহও

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

শো'আয়েব বললো ঃ "ভাইয়েরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, তারপর তিনি আমাকে উত্তম রিযিকও দান করেন[৯৮] (তাহলে এরপর আমি তোমাদের গোমরাহী ও হারামখোরীর কাজে তোমাদের সাথে কেমন করে শরীক হতে পারি?) আর যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদের বিরত রাখতে চাই আমি নিজে কখনো সেগুলোতে লিপ্ত হতে চাই না।[৯৯] আমি তো আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে চাই। যাকিছু আমি করতে চাই তা সবই আল্লাহর তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাঁরি ওপর আমি ভরসা করেছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে রুজু করি।

জাগে যে, এবার খুব শিগগির চরিত্র, নৈতিকতা ও দীনদারীর ওয়াজ–নসীহত শুরু হয়ে যাবে আর এ সাথে সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি দিকে খুঁত বের করার একটি দীর্ঘ সিলসিলার সূচনা হবে। এ কারণেই এ ধরনের সমাজে নামায সবচেয়ে বেশী ভর্ৎসনা, তিরস্কার, নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। আর নামাযী সম্পর্কে পূর্বাহ্নে যে ধরনের আশংকা করা হয়েছিল কোন নামাযী যদি ঠিক সেই পর্যায়েই অসৎকাজের সমালোচনা ও ভালো কাজ করার উপদেশ দিতে শুরু করে দেয় তাহলে তো নামাযীকে এমনভাবে দোষারোপ করা শুরু হয়ে যায় যেন সে–ই এসব আপদের উৎস।

৯৭. এ বক্তব্যটি ইসলামের মোকাবিলায় জাহেলী মতবাদের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরছে। ইসলামের দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, আল্লাহর বন্দেগী ছাড়া বাকি অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতিই ভুল। এগুলো অনুসরণ করা উচিত নয়। কারণ অন্য কোন পদ্ধতির পক্ষে বুদ্ধি, জ্ঞান ও আসমানী কিতাবসমূহে কোন যুক্তি–প্রমাণ নেই। আর তাছাড়া শুধুমাত্র একটি সীমিত ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আল্লাহর বন্দেগী হওয়া উচিত নয় বরং তামাদ্দুনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সকল বিভাগেই হওয়া উচিত। কারণ দুনিয়ায় মানুষের কাছে যা কিছু আছে সব আল্লাহর মালিকানাধীন। আল্লাহর ইচ্ছার গণ্ডী ভেদ করে স্বাধীনভাবে কোন একটি জিনিসও মানুষ ব্যবহার করার অধিকার রাখে না। এর মোকাবিলায় জাহেলী মতবাদ হচ্ছে, বাপ–দাদা থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছে মানুষের তারই অনুসারী হওয়া উচিত। এর অনুসরণের জন্য এ ছাড়া আর অতিরিক্ত কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, এটা বাপ–দাদাদের পদ্ধতি। তাছাড়া শুধুমাত্র পূজা–অর্চনার

সাথে দীন ও ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে। আর আমাদের জীবনের সাধারণ পার্থিব বিষয়াবলীর ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার, যেভাবে ইচ্ছা আমরা সেভাবে কাজ করতে পারি।

এ থেকে একথাও আন্দাজ করা যেতে পারে যে, জীবনকে ধর্মীয় ও পার্থিব এ দু'ভাগে ভাগ করার চিন্তা আজকের কোন নতুন চিন্তা নয় বরং আজ থেকে তিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে হযরত শো'আয়েব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ও এ বিভক্তির ওপর ঠিক তেমনিই জোর দিয়েছিল যেমন আজকের যুগে পাশ্চাত্যবাসীরা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় শাগরিদবৃন্দ জোর দিচ্ছেন। এটা আসলে কোন "নতুন আলো" বা "প্রগতি" নয় যা "মানসিক উন্নয়নে"র কারণে মানুষ আজ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বরং এটা সেই একই পুরাতন অন্ধকার ও পশ্চাতপদ চিন্তা যা হাজার হাজার বছর আগের জাহেলিয়াতের মধ্যেও আজকের মতো একই আকারে বিরাজমান ছিল। এর সাথে ইসলামের সংঘাত আজকের নয়, অনেক পুরাতন।

৯৮. রিজিক শব্দটি এখানে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সত্য–সঠিক জ্ঞান, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এ শব্দটি থেকে সাধারণত যে অর্থ বুঝা যায় সেটি অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য যে জীবন সামগ্রী দান করে থাকেন। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে এ আয়াত থেকে এমন একটি বিষয়বস্তুর প্রকাশ ঘটে, যা এ সূরায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ (আ) ও সালেহ আলাইহিস সালামের মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ নবুওয়াতের আগেও আমি নিজের রবের পক্ষ থেকে সত্যের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ নিজের মনের মধ্যে ও বিশ্ব–জগতের সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে পাচ্ছিলাম এবং এরপর আমার রব আমাকে সরাসরিভাবেও সত্য–জ্ঞান দান করেছেন। এখন তোমরা যেসব গোমরাহী ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছো তাতে আমার পক্ষে জেনে বুঝে লিপ্ত হওয়া কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে? আর দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে হযরত শো'আয়েবকে তারা ভর্ৎসনা করেছিল এ আয়াতটিকে তার জওয়াব বলা যায়। হযরত শো'আয়েবকে তারা ভর্ৎসনা করে বলেছিল ঃ "ব্যস শুধু তুমিই রয়ে গেছো একজন উদারমনা ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি! এ কড়া ও তিক্ত অক্রমণের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ "ভাইয়েরা! যদি আমার রব সত্যকে চিনবার মতো অন্তরদৃষ্টি এবং হালাল রিযিক আমাকে দিয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের নিন্দাবাদের কারণে এ অনুগ্রহ কি করে বিগ্রহে পরিণত হবে? আল্লাহ যখন আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন তখন তোমাদের ভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়াকে আমি সত্য ও হালাল গণ্য করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই কেমন করে?

৯৯. অর্থাৎ একথা থেকেই তোমরা আমার সত্যতা আন্দাজ করে নিতে পারো যে, অন্যদের আমি যাকিছু বলি আমি নিজেও তা করি। যদি আমি তোমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌র পূজা বেদীতে যেতে নিষেধ করতাম এবং নিজে কোন বেদীর সেবক হয়ে বসতাম তাহলে নিসন্দেহে তোমরা বলতে পারতে, নিজের পীরগিরির ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য অন্য দোকানগুলোর সুনাম নষ্ট করতে চাচ্ছি। যদি আমি তোমাদের হারাম

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের একগুঁয়েমি যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের ওপরও সেই একই আযাব এসে পড়ে, যা এসেছিল নূহ, হূদ বা সালেহের সম্প্রদায়ের ওপর। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশী দূরের নয়।[১০০] দেখো, নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। অবশ্যি আমার রব করুণাশীল এবং নিজের সৃষ্টিকে ভালোবাসেন।[১০১]

জিনিস খেতে নিষেধ করতাম এবং নিজের কারবারে বেঈমানী করতে থাকতাম তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারতে যে, আমি নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈমানদারীর ঢাক পিটাচ্ছি। কিন্তু তোমরা দেখছো, যেসব অসৎকাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি। আমি নিজেও সেগুলো থেকে দূরে থাকছি। যেসব কলংক থেকে আমি তোমাদের মুক্ত দেখতে চাচ্ছি আমার নিজের জীবনও তা থেকে মুক্ত। তোমাদের আমি যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছি আমার নিজের জন্যও আমি সেই পথটিই পছন্দ করেছি। এসব জিনিস একথা প্রমাণ করে যে, আমি যে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ।

১০০. অর্থাৎ লূতের সম্প্রদায়ের ঘটনা তো খুব বেশী দিনের কথা নয়। তোমাদের সামনে এ ঘটনা এখনো তরতাজা আছে। তোমাদের কাছাকাছি এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবত লূতের কওমের ধ্বংসের পর তখন ছ'–সাতশো বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়নি। আর ভৌগোলিক দিক দিয়েও লূতের কওম যেখানে বসবাস করতো শো'আয়েবের কওমের এলাকাও ছিল একেবারে তার লাগোয়া।

১০১. অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন শত্রুতা নেই। তাদেরকে অযথা শাস্তি দিতে তিনি চান না। নিজের বান্দাদেরকে মারপিট করে তিনি খুশী হন না। তোমরা যখন নিজেদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে সীমা অতিক্রম করে যাও এবং কোন প্রকারেই বিপর্যয় সৃষ্টিতে বিরত হও না তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাদের শাস্তি দেন। নয়তো তাঁর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমরা যতই দোষ কর না কেন যখনই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে তখনই তাঁর হৃদয়কে নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাবে। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত নেই।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿۹۱﴾

তারা জবাব দিল ঃ "হে শোআয়েব। তোমার অনেক কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না[১০২] আর আমরা দেখছি তুমি আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল ব্যক্তি। তোমার ভ্রাতৃগোষ্ঠী না থাকলে আমরা কবেই তোমাকে পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলতাম। আমাদের ওপর প্রবল হবার মতো ক্ষমতা তোমার নেই।[১০৩]

এ বিষয়বস্তুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোন ব্যক্তির উট যদি কোন বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশী হবে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এর চেয়ে আরো বেশী মর্মস্পর্শী। হযরত উমর (রা) বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। তার দুগ্ধপোষ্য শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল। মাতৃস্নেহে সে এতই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, কোন বাচ্চা সামনে দেখলেই তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরতো এবং নিজের বুকের দুধ তাকে পান করাতে থাকতো। তার এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো এ মা তার নিজের বাচ্চাকে নিজের হাতে আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে? আমরা জবাব দিলাম ঃ কখনোই নয়, তার নিজের ছুঁড়ে দেবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, বাচ্চা নিজেই যদি আগুনে পড়ে যায় তাহলে সে তাকে বাঁচাবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি বলেন ঃ

الله ارحم بعباده من هذه بولدها

"এ মহিলা তার বাচ্চার প্রতি যে পরিমাণ অনুগ্রহশীল আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর বান্দার প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশী।"

আর এমনি চিন্তা-ভাবনা করলে একথা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহই তো বাচ্চার লালন-পালনের জন্য মা-বাপের মনে স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নয়তো আল্লাহ যদি এ স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি না করে দিতেন তাহলে বাচ্চাদের মা-বাপের চেয়ে বড় শত্রু আর হতো না। কারণ তারা মা-বাপের জন্য হয় সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। এখন যে আল্লাহ মাতৃ-পিতৃস্নেহের স্রষ্টা তার নিজের মধ্যে নিজের সৃষ্টির জন্য কি পরিমাণ স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা থাকবে—একথা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই আন্দাজ করতে পারে।

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَهْطِيٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ
ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَٰمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾
وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِي دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٩٤﴾
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

শো'আয়েব বললো ঃ "ভাইয়েরা! আমার ভ্রাতৃজোট কি তোমাদের ওপর আল্লাহর চাইতে প্রবল যে, তোমরা (ভ্রাতৃজোটের ভয় করলে এবং) আল্লাহকে একেবারে পেছনে ঠেলে দিলে? জেনে রাখো, যাকিছু তোমরা করছো তা আল্লাহর পাকড়াও–এর বাইরে নয়। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের পথে কাজ করে যাও এবং আমি আমার পথে কাজ করে যেতে থাকবো। শিগগীরই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনার আযাব আসছে এবং কে মিথ্যুক? তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত রইলাম।"

শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজের রহমতের সাহায্যে শো'আয়েব ও তার সাথী মুমিনদেরকে উদ্ধার করলাম। আর যারা জুলুম করেছিল একটি প্রচণ্ড আওয়াজ তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করলো যে, নিজেদের আবাসভূমিতেই তারা নির্জীব নিস্পন্দের মতো পড়ে রইলো, যেন তারা সেখানে কোনদিন বসবাসই করতো না।

শোন, মাদয়ানবাসীরাও দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন সামূদ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

১০২. হযরত শো'আয়েব কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলছিলেন তাই তারা বুঝতে পারছিল না, এমন কোন ব্যাপার ছিল না। অথবা তাঁর কথা কঠিন, সূক্ষ্ম বা জটিলও ছিল না। কথা সবই সোজা ও পরিষ্কার ছিল। সেখানকার প্রচলিত ভাষায়ই কথা বলা হতো। কিন্তু তাদের মানসিক কাঠামো এত বেশী বেঁকে গিয়েছিল যে, হযরত শো'আয়েবের সোজা সরল কথাবার্তা তার মধ্যে কোনপ্রকারেই প্রবেশ করতে পারতো না। একথা স্বতসিদ্ধ যে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُوا فِي
هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَٰلِكَ مِنْ
أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

৯ রুকূ'

আর মূসাকে আমি নিজের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট নিয়োগপত্রসহ ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা ফেরাউনের নির্দেশ মেনে চললো। অথচ ফেরাউনের নির্দেশ সত্যাশ্রয়ী ছিল না। কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্বে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।[১০৪] অবস্থানের জন্য কেমন নিকৃষ্ট স্থান সেটা! আর তাদের ওপর এ দুনিয়ায় লানত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও পড়বে। কত নিকৃষ্ট প্রতিদান সেটা, যা কেউ লাভ করবে!

এগুলো কতক জনপদের খবর, যা আমি তোমাকে শুনাচ্ছি। এদের কোনটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আবার কোনটার ফসল কাটা হয়ে গেছে।

যারা অন্ধপ্রীতি, বিদ্বেষ ও গোষ্ঠী স্বার্থ দোষে দুষ্ট হয় এবং প্রবৃত্তির লালসার পূজা করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমির নীতি অবলম্বন করে, আবার এ সংগে কোন বিশেষ চিন্তাধারার ওপর অনড় হয়ে বসে থাকে তারা তো প্রথমত এমন কোন কথা শুনতেই পারে না যা তাদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর আর যদি কখনো শুনেই নিয়ে থাকে তাহলে তারা বুঝতেই পারে না যে, এসব আবার কেমন ধারার কথা!

১০৩. একথা অবশ্যি সামনে থাকা দরকার যে, এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন হুবহু একই রকম অবস্থা মক্কাতেও বিরাজ করছিল। সে সময় কুরাইশরাও একইভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর জীবননাশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু শুধু বনী হাশেম তাঁর পেছনে ছিল বলেই তাঁর গায়ে হাত দিতে ভয় পাচ্ছিল। কাজেই হযরত শো'আয়েব ও তার কওমের এ ঘটনাকে যথাযথভাবে কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে হযরত শো'আয়েবের যে চরম শিক্ষণীয়

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾

আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে। আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেলো তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের যেসব মাবুদকে ডাকতো তারা তাদের কোন কাজে লাগলো না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন উপকার করতে পারলো না।

জবাব উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের জন্যও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ একই জবাব দেয়া হলো।

১০৪. এ আয়াত ও কুরআনের অন্য কিছু বক্তব্য থেকে জানা যায়, যারা দুনিয়ায় কোন জাতির বা দলের নেতৃত্ব দেয় কিয়ামতের দিনও তারাই তাদের নেতা হবে। যদি তারা দুনিয়ায় নেকী, সততা ও সত্যের পথে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে তাহলে এখানে যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারা কিয়ামতের দিনও তাদেরই পতাকাতলে সমবেত হবে এবং তাদের নেতৃত্বে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। আর যদি তারা দুনিয়ায় কোন ভ্রষ্টতা, নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ও এমনং কোন পথের দিকে মানুষকে আহবান জানিয়ে থাকে যা সত্য দীনের পথ নয়, তাহলে যারা এখানে তাদের পথে চলেছে তারা সেখানেও তাদেরই পেছনে থাকবে এবং তাদের নেতৃত্বে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি এ একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করছে ঃ

امرو القيس حامل لواء شعراء الجاهلية الى النار

"কিয়ামতের দিন কবি ইমরাউল কয়েসের হাতে থাকবে জাহেলী কাব্যচর্চার ঝাণ্ডা এবং আরবের জাহেলিয়াত পন্থী সমস্ত কবি তার নেতৃত্বে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাবে।"

এ দু'ধরনের শোভাযাত্রা কোন্ ধরনের জৌলুস ও জাঁক জমকের সাথে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে তার চিত্র এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তা ও কল্পনার পটে এঁকে নিতে পারে। যেসব নেতা দুনিয়ায় লোকদেরকে গোমরাহ করেছে এবং সত্য বিরোধী পথে চালিয়েছে তাদের অনুসারীরা যখন নিজেদের চোখে দেখে নেবে এ জালেমরা কী ভয়াবহ পরিণতির দিকে তাদেরকে টেনে এনেছে তখন তারা নিজেদের সমস্ত বিপদ–

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝١٠٢ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝١٠٣

আর তোমার রব যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন তখন তার পাকড়াও এমনি ধরনেরই হয়। প্রকৃতপক্ষে তার পাকড়াও হয় বড়ই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক। আসলে এর মধ্যে একটি নিশানী আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আখেরাতের আযাবের ভয় করে।[১০৫] তা হবে এমন একটি দিন যেদিন সমস্ত লোক একত্র হবে এবং তারপর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।

মুসীবতের জন্য তাদেরকে দায়ী মনে করবে এবং তাদের শোভাযাত্রা তাদেরকে নিয়ে এমন অবস্থায় জাহান্নামের দিকে রওয়ানা দেবে যে, আগে আগে তাদের নেতারা চলবে এবং তারা পেছনে পেছনে তাদেরকে গালি দিতে দিতে এবং তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে চলতে থাকবে। অন্যদিকে যাদের নেতৃত্ব মানুষকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী করবে তাদের অনুসারীরা নিজেদের শুভ পরিণাম দেখে তাদের নেতাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে এবং তাদের ওপর প্রশংসা ও শুভেচ্ছার পুষ্প বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে যাবে।

১০৫. অর্থাৎ ইতিহাসের এ ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি নিশানী রয়েছে যে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে মানুষের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আখেরাতের আযাব অবশ্যি আসবে এবং এ সম্পর্কিত নবীদের দেয়া খবর সত্য। তাছাড়া এ নিশানী থেকে সেই আখেরাতের আযাব কেমন কঠিন ও ভয়াবহ হবে সেকথাও জানতে পারবে। ফলে এ জ্ঞান তার মনে ভীতির সঞ্চার করে তাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইতিহাসের সেই জিনিসটি কি, যাকে আখেরাত ও তার আযাবের আলামত বলা যেতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি ইতিহাসকে শুধুমাত্র ঘটনার সমষ্টি মনে করে না বরং এ ঘটনার যুক্তি প্রমাণ নিয়েও মাথা ঘামায় এবং তা থেকে ফলাফল গ্রহণ করতেও অভ্যস্ত হয় সে সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে। মানব জাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে যে ধারাবাহিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে জাতি, সম্প্রদায় ও দলের উত্থান ও পতন ঘটতে থেকেছে এবং এ উত্থান ও পতনে যেমন সুস্পষ্টভাবে কিছু নৈতিক কার্যকারণ সক্রিয় থেকেছে আর পতনশীল জাতিগুলো যে ধরনের মারাত্মক ও শিক্ষণীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে পতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে—এসব কিছুই এ অকাট্য সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিতবহ যে, মানুষ এ বিশ্ব–জাহানে এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির অধীন যে নিছক অন্ধ প্রাকৃতিক আইনের ওপর রাজত্ব করছে না বরং তার নিজের এমন একটি ন্যায়সংগত নৈতিক বিধান আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে

وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿۱۰۴﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿۱۰۵﴾

তাকে আনার ব্যাপারে আমি কিছু বেশী বিলম্ব করছি না, হাতে গোনা একটি সময়কাল মাত্র তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেদিন যখন আসবে তখন কারোর কথা বলার সামর্থ থাকবে না, তবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কেউ কথা বলতে পারবে।[১০৬] *তারপর আবার সেদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক ভাগ্যবান।*

নৈতিকতার একটি বিশেষ সীমানার ওপরে অবস্থানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে, যারা এ সীমানার নীচে নেমে আসে তাদেরকে কিছুকালের জন্য ঢিল দিতে থাকে এবং যখন তারা এর অনেক নীচে নেমে যায় তখন তাদেরকে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দেয় যে, তারা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটি শিক্ষণীয় ইতিহাস হয়ে যায়। একটি ধারাবাহিক বিন্যাস সহকারে সবসময় এ ঘটনাবলীর প্রকাশ হতে থাকার ফলে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না যে, পুরস্কার ও শাস্তি এবং প্রতিদান ও প্রতিবিধান এ বিশ্ব–জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্থায়ী আইন।

তারপর বিভিন্ন জাতির ওপর যেসব আযাব এসেছে সেগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনুমান করা যায় যে, আইনের দৃষ্টিতে পুরস্কার ও শাস্তির নৈতিক দাবী এ আযাবগুলোর মাধ্যমে কিছুটা অবশ্যি পূর্ণ হয়েছে কিন্তু এখনো এ দাবীর বিরাট অংশ অপূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যে আযাব এসেছে তা কেবলমাত্র সমকালে দুনিয়ার বুকে যে প্রজন্ম বর্তমান ছিল তাদেরকেই পাকড়াও করেছে। কিন্তু যে প্রজন্ম অসৎকাজের বীজ বপন করে জুলুম–নির্যাতন ও অসৎকাজের ফসল তৈরী করে তা কাটার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং যাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হলো পরবর্তী প্রজন্মকে, তারা যেন প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনের কার্যকারিতা থেকে পরিষ্কার গা বাঁচিয়ে চলে গেছে। এখন যদি আমরা ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশ্ব–জাহানের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মেজাজ সঠিকভাবে বুঝতে পেরে থাকি। তাহলে আমাদের এ অধ্যয়নই একথার সাক্ষ দেবার জন্য যথেষ্ট যে, ইনসাফ ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনের যে নৈতিক চাহিদাগুলো এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে সেগুলো পূর্ণ করার জন্য এ ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আবার একটি দ্বিতীয় বিশ্বের জন্ম দেবে এবং সেখানে দুনিয়ার সমস্ত জালেমকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে। সেই বদলা দুনিয়ার এ আযাবগুলো থেকে হবে অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর। (দেখুন সূরা আ'রাফ ৩০ এবং সূরা ইউনূস ১০ টীকা।)

১০৬. অর্থাৎ এ নির্বোধরা নিজেদের মনে এ ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, অমুক হুযুর আমাদের পক্ষে সুপারিশ করে আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, অমুক বুযর্গ জিদ ধরে বসে যাবেন এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক ব্যক্তির গুনাহ মাফ করিয়ে না নিয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠবেন না। অমুক হুযুর, যিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র, জান্নাতের পথে গোঁ ধরে বসে

فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقُوْا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِیْهَا زَفِیْرٌ وَّشَهِیْقٌ ﴿۱۰۶﴾ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ ﴿۱۰۷﴾ وَاَمَّا الَّذِیْنَ سُعِدُوْا فَفِی الْجَنَّةِ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَیْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿۱۰۸﴾ فَلَا تَكُ فِیْ مِرْیَةٍ مِّمَّا یَعْبُدُ هٰۤؤُلَآءِ ؕ مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا یَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِیْبَهُمْ غَیْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿۱۰۹﴾

হতভাগ্যরা জাহান্নামে যাবে (যেখানে অত্যধিক গরমে ও পিপাসায়) তারা হাঁপাতে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে। আর এ অবস্থায় তারা চিরকাল থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে,[১০৭] তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান। অবশ্যি তোমার রব যা চান তা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন।[১০৮] আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান।[১০৯] এমন পুরস্কার তারা পাবে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।

কাজেই হে নবী! এরা যেসব মাবুদের ইবাদাত করছে তাদের ব্যাপারে তুমি কোন প্রকার সন্দেহের মধ্যে থেকো না। এরা তো (নিছক গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে।) ঠিক তেমনিভাবে পূজা–অর্চনা করে যাচ্ছে যেমন পূর্বে এদের বাপ–দাদারা করতো।[১১০] আর আমি কিছু কাটছাঁট না করেই তাদের অংশ তাদেরকে পুরোপুরি দিয়ে দেবো।

পড়বেন এবং নিজের অনুসারীদের বখশিশের পরোয়ানা আদায় করিয়ে নিয়েই ছাড়বেন। অথচ জিদ করা ও গোঁ ধরাতো দূরের কথা সেদিনের সেই আড়ম্বরপূর্ণ মহিমান্বিত আদালতে অতি বড় কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তি এবং মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাও টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। আর যদি কেউ সেখানে কিছু বলতে পারে তাহলে একমাত্র বিশ্ব জাহানের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মহান অধিকারীর নিজের প্রদত্ত অনুমতি সাপেক্ষেই বলতে পারবে। কাজেই যারা একথা বুঝেই গায়রুল্লাহর বেদীমূলে নযরানা ও ভেট চড়ায় যে, এরা আল্লাহর দরবারে বড়ই প্রভাবশালী এবং তাদের সুপারিশের ভরসায় নিজেদের আমলনামা কালো করে যেতে থাকে, তাদের সেখানে চরম হতাশার সম্মুখীন হতে হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১০ রুকূ'

আমি এর আগে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি এবং সে সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের এই যে কিতাব দেয়া হয়েছে এ সম্পর্কে করা হচ্ছে[১১১])। যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে একটি কথা প্রথমেই স্থির করে না দেয়া হতো তাহলে এ মতভেদকারীদের মধ্যে কবেই ফায়সালা করে দেয়া হয়ে যেতো।[১১২] একথা সত্যি যে, এরা তার ব্যাপারে সন্দেহ ও পেরেশানীর মধ্যে পড়ে রয়েছে।

১০৭. এ শব্দগুলোর অর্থ পরকালীন জগতের আকাশ ও পৃথিবী হতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, নিছক সাধারণ বাকধারা হিসেবে একে চিরকালীন স্থায়িত্ব অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা এর অর্থ বর্তমান পৃথিবী ও আকাশ তো কোনক্রমেই হতে পারে না। কারণ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামতের দিন এগুলো বদলে দেয়া হবে এবং এখানে যেসব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো কিয়ামতের পরে ঘটবে।

১০৮. অর্থাৎ তাদেরকে এ চিরন্তন আযাব থেকে বাঁচাবার মতো আর কোন শক্তিই তো নেই। তবে আল্লাহ নিজেই যদি কারোর পরিণতি বদলাতে চান অথবা কাউকে চিরন্তন আযাব দেবার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাব দিয়ে মাফ করে দেবার ফায়সালা করে নেন তাহলে এমনটি করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর আছে। কারণ তিনি নিজেই নিজের আইন রচয়িতা। তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতাকে সীমিত করে দেবার মতো কোন উচ্চতর আইন নেই।

১০৯. অর্থাৎ তাদের জান্নাতে অবস্থান করাও এমন কোন উচ্চতর আইনের ভিত্তিতে হবে না, যা আল্লাহকে এমনটি করতে বাধ্য করে রেখেছে। বরং আল্লাহ যে তাদেরকে সেখানে রাখবেন এটা হবে সরাসরি তাঁর অনুগ্রহ। যদি তিনি তাদের ভাগ্য বদলাতে চান, তা করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর আছে।

১১০. এর অর্থ এ নয় যে, এ মাবুদদের ব্যাপারে সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল। বরং আসলে একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে শুনানো হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, এরা যে এসব মাবুদের পূজা করছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করছে ও ভিক্ষা মাগছে, নিশ্চয়ই এরা কিছু দেখে থাকবে যে কারণে এরা এদের থেকে উপকৃত হবার আকাংখা পোষণ করে—কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এ ধরনের কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, এ পূজা-অর্চনা, নযরানা ও প্রার্থনা আসলে কোন অভিজ্ঞতা ও সত্যিকার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নয় বরং এসব কিছু করা হচ্ছে নিছক অন্ধ অনুসৃতির

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

আর একথাও সত্যি যে, তোমার রব তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি বদলা দিয়েই তবে ক্ষান্ত হবেন। অবশ্যি তিনি তাদের সবার কার্যকলাপের খবর রাখেন। কাজেই হে মুহাম্মাদ। তুমিও তোমার সাথীরা যারা (কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছে সত্য সঠিক পথে অবিচল থাকো যেমন তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার ওপর তোমাদের রব দৃষ্টি রাখেন। এ জালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে এবং তোমরা এমন কোন পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোন সাহায্য পৌঁছুবে না।

ভিত্তিতে। এসব বেদী ও আস্তানা পূর্ববর্তী জাতিদেরও ছিল এবং তাদের এ ধরনের কেরামতি ও অলৌকিক কার্যকলাপ তাদের মধ্যেও লোকমুখে খুব বেশী শোনা যেতো। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এলো তখন তারা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং বেদী ও আস্তানাগুলো কোন কাজে লাগলো না।

১১১. অর্থাৎ এ কুরআন সম্পর্কে আজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলছে, নানা রকম সন্দেহ–সংশয় পোষণ করছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। বরং এর আগে মূসাকে যখন কিতাব দেয়া হয়েছিল তখন তার ব্যাপারেও এ ধরনের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। কাজেই হে মুহাম্মাদ! এমন সোজা, সরল ও পরিষ্কার কথা কুরআনে বলা হচ্ছে এবং তারপরও লোকেরা তা গ্রহণ করছে না—এ অবস্থা দেখে তোমার মন খারাপ করা ও হতাশ হওয়া উচিত নয়।

১১২. এ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদারদেরকে নিশ্চিন্ত ও তাদের মনে স্থৈর্য সৃষ্টি করার জন্য বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যারা এ কুরআনের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করছে তাদের ফায়সালা শিগ্‌গির চুকিয়ে দেবার ব্যাপারটি নিয়ে তোমরা অস্থির হয়ো না। আল্লাহ প্রথমেই স্থির করে নিয়েছেন যে, ফায়সালা নির্দিষ্ট সময়ের আগে করা হবে না এবং দুনিয়ার লোকেরা ফায়সালা চাওয়ার ব্যাপারে যে তাড়াহুড়ো করে থাকে আল্লাহ ফায়সালা করে দেয়ার ব্যাপারে সে ধরনের তাড়াহুড়ো করবেন না।

وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

আর দেখো, নামায কায়েম করো দিনের দু' প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর।[১১৩] আসলে সৎকাজ অসৎকাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক তাদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে।[১১৪] আর সবর করো কারণ আল্লাহ সৎকর্মকারীদের কর্মফল কখনো নষ্ট করেন না।

তাহলে তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন সব লোক থাকলো না কেন যারা লোকদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিতো? এমন লোক থাকলেও অতি সামান্য সংখ্যক ছিল। তাদেরকে আমি ঐ জাতিদের থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। নয়তো জালেমরা তো এমনি সব সুখৈশ্বর্যের পেছনে দৌড়াতে থেকেছে, যার সরঞ্জাম তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়েছিল এবং তারা অপরাধী হয়েই গিয়েছিল। তোমার রব এমন নন যে, তিনি জনবসতিসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।[১১৫]

১১৩. দিনের দু' প্রান্ত বলতে ফজর ও মাগরিব এবং কিছু রাত অতিবাহিত হবার পর বলতে এশার সময় বুঝানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, এ বক্তব্য এমন এক সময়ের যখন পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিত হয়নি। মি'রাজের ঘটনা এরপর সংঘটিত হয় এবং তাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বিধান দেয়া হয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন বনী ইসরাঈল ৯৫, ত্বা-হা ১১১, রূম ১২৪ টীকা)

১১৪. অর্থাৎ যেসব অসৎকাজ দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে এবং সত্যের এ দাওয়াতের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে তোমাদের সাথে যেসব অসৎকাজ করা হচ্ছে এসবগুলো দূর করার আসল পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেরা অনেক বেশী সৎ হয়ে যাও এবং নিজেদের সৎকাজের সাহায্যে এ অসৎকাজকে পরাস্ত করো। আর তোমাদের সৎ বানাবার সর্বোত্তম

মাধ্যম হচ্ছে এ নামায। নামায আল্লাহর স্মরণকে তরতাজা করতে থাকবে এবং তার শক্তির জোরে তোমরা অসৎকাজের এ সংঘবদ্ধ তুফানী শক্তির কেবল মোকাবিলাই করতে পারবে তাই নয় বরং দুনিয়ায় কার্যত সৎকাজ ও কল্যাণের ব্যবস্থাও কায়েম করতে পারবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আনকাবুত ৭৭–৭৯ টীকা)

১১৫. আগের ছ'টি রুকূ'তে যেসব জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতগুলোতে অত্যন্ত শিক্ষণীয় পদ্ধতিতে তাদের ধ্বংসের মূল কারণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ইতিহাসের ওপর মন্তব্য করে বলা হচ্ছে, শুধুমাত্র এ জাতিগুলোকেই নয় বরং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতিই ধ্বংস হয়েছে তাদের সবাইকে যে জিনিসটি অধপতিত করেছে তা হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ নিজের নিয়ামতের দ্বারা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন তখন নিজেদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির নেশায় মত্ত হয়ে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছে এবং তাদের সামষ্টিক প্রকৃতি এমন পর্যায়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মতো সৎ লোক তাদের মধ্যে ছিলই না অথবা যদি এমনি ধরনের কিছু লোক থেকেও থাকে তাহলে তাদের সংখ্যা এত কম ছিল এবং তাদের আওয়াজ এতই দুর্বল ছিল যে, অসৎকাজ থেকে তারা বিরত রাখার চেষ্টা করলেও বিপর্যয় ঠেকাতে পারেনি। এ কারণেই শেষ পর্যন্ত এ জাতিগুলো আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছে। নয়তো নিজের বান্দাদের সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা নেই। তারা ভালো কাজ করে যেতে থাকলেও আল্লাহ অযথা তাদেরকে শাস্তি দেন না। আল্লাহর এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য এখানে তিনটি কথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া।

এক ঃ প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় ভালো কাজের দিকে আহবানকারী ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মতো সৎলোকের উপস্থিতি অপরিহার্য। কারণ সৎবৃত্তিই আল্লাহর কাছে কাংখিত। আর মানুষের অসৎকাজ যদি আল্লাহ বরদাশত করে থাকেন তাহলে তা শুধুমাত্র তাদের মধ্যকার এ সৎবৃত্তির কারণেই করে থাকেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত করে থাকেন যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৎ প্রবণতার কিছুটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোন মানব গোষ্ঠী যখন একেবারেই সৎলোক শূন্য হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে শুধু অসৎলোকই বর্তমান থাকে অথবা সৎলোক বর্তমান থাকলেও তাদের কথা কেউ শোনে না এবং সমগ্র জাতিই একসাথে নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন আল্লাহর আযাব তাদের মাথার ওপর এমনভাবে ঘুরতে থাকে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারী, যার গর্ভকাল একেবারে টায় টায় পূর্ণ হয়ে গেছে, কেউ বলতে পারে না কোন্ মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করে বসবে।

দুই ঃ যে জাতি নিজের মধ্যে সবকিছু বরদাশ্‌ত করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র এমন গুটিকয় হাতে গোনা লোককে বরদাশত করতে পারে না যারা তাকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ও সৎকাজ করার দাওয়াত দেয়, সে জাতির ব্যাপারে একথা জেনে নাও যে, তার দুর্দিন কাছে এসে গেছে। কারণ এখন সে নিজেই নিজের প্রাণের শত্রু হয়ে গেছে। যেসব জিনিস তার ধ্বংসের কারণ সেগুলো তার অতি প্রিয় এবং শুধুমাত্র একটি জিনিসই সে একদম বরদাশত করতে প্রস্তুত নয় যা তার জীবনের ধারক ও বাহক।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾

অবশ্যি তোমার রব চাইলে সমগ্র মানব জাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং বিপথে যাওয়া থেকে একমাত্র তারাই বাঁচবে যাদের ওপর তোমার রব অনুগ্রহ করেন। এ (নির্বাচন ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতার) জন্যই তো তিনি তাদের পয়দা করেছিলেন।[১১৬] আর তোমার রবের একথা পূর্ণ হয়ে গেছে যা তিনি বলেছিলেন—"আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে ভরে দেবো।"

তিন ঃ একটি জাতির মধ্যে সৎকাজ করার আহবানে সাড়া দেবার মতো লোক কি পরিমাণ আছে তার ওপর নির্ভর করে তার আযাবে লিপ্ত হওয়ার ও না হওয়ার ব্যাপারটির শেষ ফায়সালা। যদি তার মধ্যে বিপর্যয় খতম করে কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লোকের সংখ্যা এমন পর্যায়ে থাকে যা এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর সাধারণ আযাব পাঠানো হয় না। বরং ঐ সৎলোকদেরকেই অবস্থার সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু লাগাতার প্রচেষ্টা ও সাধনা করার পরও যদি তার মধ্যে সংস্কার সাধনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক না পাওয়া যায় এবং এ জাতি তার অংগন থেকে কয়েকটা হীরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার পর নিজের কার্যধারা থেকে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, এখন তার কাছে শুধু কয়লা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাহলে এরপর আর বেশী সময় হাতে থাকে না। এরপর শুধুমাত্র কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়, যা কয়লাগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন যারিয়াত ৩৪ টীকা)

১১৬. সাধারণত এ ধরনের অবস্থায় তকদীরের নামে যে সন্দেহের অবতারণা করা হয়ে থাকে এটি তার জবাব। ওপরে অতীতের জাতিদের ধ্বংসের যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারতো যে, তাদের মধ্যে সৎলোক না থাকা বা অতি অল্প সংখ্যক থাকাও আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে শামিল ছিল, এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জাতিদেরকে এ জন্য দায়ী করা হচ্ছে কেন? তাদের মধ্যে আল্লাহ বিপুল সংখ্যক সৎলোক সৃষ্টি করে দিলেন না কেন? এর জবাবে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কিত বাস্তব সত্যটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পশু, উদ্ভিদ ও অন্যান্য সৃষ্টির মতো মানুষকেও প্রকৃতিগতভাবে একটি নির্দিষ্ট ও গতানুগতিক পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য করা হবে এবং এ পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন পথে সে চলতে পারবে না, মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ এটা কখনোই চান না। যদি এটাই তাঁর ইচ্ছা হতো তাহলে ঈমানের দাওয়াত, নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের কি প্রয়োজন ছিল? সমস্ত মানুষ মুমিন ও

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ
فِى هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُل لِّلَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَٰمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَٱنتَظِرُوٓا۟ ۖ
إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ
ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

আর হে মুহাম্মাদ! এ রসূলদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, এসব এমন জিনিস যার মাধ্যমে আমি তোমার হৃদয়কে মজবুত করি। এসবের মধ্যে তুমি পেয়েছো সত্যের জ্ঞান এবং মুমিনরা পেয়েছে উপদেশ ও জাগরণবাণী। তবে যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বলে দাও তোমরা তোমাদের পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকো এবং আমরা আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করে যাই। কাজের পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা করো এবং আমরাও অপেক্ষায় আছি। আকাশে ও পৃথিবীতে যাকিছু লুকিয়ে আছে সবই আল্লাহর কুদরাতের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁরই দিকে রুজু করা হয়। কাজেই হে নবী! তুমি তাঁর বন্দেগী করো এবং তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। যাকিছু তোমরা করছো তা থেকে তোমার রব গাফেল নন।[১১৭]

মুসলমান হিসেবে পয়দা হতো এবং কুফরী ও গুণাহগারীর কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তা আসলে হচ্ছে এই যে, তাকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। তাকে নিজের পছন্দ মাফিক বিভিন্ন পথে চলার ক্ষমতা দেয়া হবে। তার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের পথ খুলে দেয়া হবে। তারপর প্রত্যেকটি মানুষকে ও মানুষের প্রত্যেকটি দলকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি পথ নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়ে তার ওপর চলার সুযোগ দেয়া হবে। এর ফলে প্রত্যেকে নিজের প্রচেষ্টা ও উপার্জনের ফল হিসেবেই সবকিছু লাভ করবে। কাজেই যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে মানুষকে পয়দা করা হয়েছে তা যখন নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং কুফরী ও ঈমানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তখন যে জাতি নিজে অসৎ পথে এগিয়ে যেতে চায়, আল্লাহ তাকে জোর করে সৎ পথে নিয়ে যাবেন এটা কেমন করে হতে পারে? কোন জাতি যখন নিজের নির্বাচনের ভিত্তিতে মানুষ তৈরীর এমন এক কারখানা বানিয়েছে যার ছাঁচ থেকে সবচেয়ে বড় অসৎ, ব্যভিচারী, জালেম ও ফাসেক লোক তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন আল্লাহ কেন সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সেখানে এমন সব জন্মগত সৎলোক

সরবরাহ করবেন যারা তার বিকৃত ছাঁচগুলোকে ঠিক করে দেবে? এ ধরনের হস্তক্ষেপ আল্লাহর রীতি বিরোধী। সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের লোক প্রত্যেক জাতি নিজেই সরবরাহ করবে। যে জাতি সমষ্টিগতভাবে অসৎ পথ পছন্দ করবে, যার মধ্য থেকে সততার ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোক এগিয়ে আসবে না এবং যে তার সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কার প্রচেষ্টার বিকশিত হওয়া ও সমৃদ্ধি লাভ করার কোন অবকাশই রাখবে না, আল্লাহ তাকে জোর করে সৎ বানাতে যাবেন কেন? তিনি তো তাকে সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে দেবেন যা সে নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছে। তবে আল্লাহর রহমতের অধিকারী যদি কোন জাতি হতে পারে তাহলে সে হবে একমাত্র সেই জাতি যার মধ্যে এমন বহু লোকের জন্ম হবে যারা নিজেরা সৎকর্মশীলতা, কল্যাণ ও ন্যায়ের দাওয়াতে সাড়া দেবে এবং এ সংগে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার সাধনকারীদের কাজ করতে পারার মতো পরিবেশ ও যোগ্যতা টিকিয়ে রাখবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আনআম ২৪ টীকা)

১১৭. অর্থাৎ কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতের সাথে জড়িত উভয় পক্ষ যা কিছু করছে আল্লাহ তা দেখছেন। আল্লাহর রাজত্বে কোন অন্যায় ও দুঃশাসনের স্থান নেই। রাজ্যে যাচ্ছেতাই হতে থাকবে কিন্তু শাসক রাজার তার কোন খবরই থাকবে না এবং তিনি এসবের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবেন না, এ ধরনের কোন পরিস্থিতি এখানে নেই। এখানে বিজ্ঞতা, কৌশল ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে বিলম্ব অবশ্যি হয় কিন্তু অরাজকতা ও অন্যায়ের কোন স্থান নেই। যারা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তারা বিশ্বাস করুন তাদের পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে না। আর যারা বিপর্যয় সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণে লিপ্ত আছে, যারা সংশোধন প্রচেষ্টাকারীদের ওপর জুলুম ও নির্যাতন চালাচ্ছে এবং সংশোধনের এ কাজকে যেনতেন প্রকারে অগ্রসর হতে না দেয়ার জন্য নিজেদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরও জেনে রাখা উচিত যে, তাদের এসব কার্যকলাপ আল্লাহর জানা আছে এবং এর পরিণাম তাদের অবশ্যি ভোগ রকতে হবে।